উপন্যাস

অরণ্যের দিনরাত্রি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
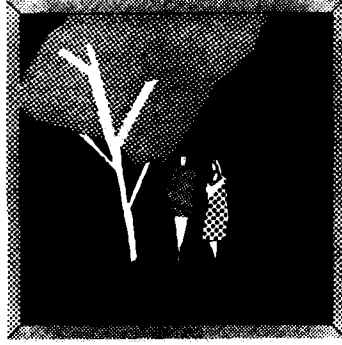
অরণ্যের দিনরাত্রি

সকালবেলা ধলভূমগড় স্টেশনে চারজন যুবক ট্রেন থেকে নামলো। ছোট্ট স্টেশন, সারা দিন-রাতে দু'তিনবার মাত্র সরব হয়ে ওঠে, বাকি সময়টা অলসভাবে নিঝুম। আলাদা টিকিট কালেক্টার নেই, স্টেশন মাস্টার নিজেই ট্রেন থেকে নামা ছোট্ট যাত্রীদলের দিকে এগিয়ে আসেন টিকিটের জন্য—যাত্রীরা অধিকাংশ স্থানীয় লোক, নেংটি পরা সাঁওতাল আর ওরাওঁ—তাদের প্রত্যেকেরই কাঁধে একখানা করে লাঠি, আট হাত শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরা মেয়েরা—আম্র পল্লবের মতন তারা পাঁচজন পাঁচজন হাত ধরাধরি করে থাকে ও গানের সুরে কথা বা ঝগড়া করে যায়, এ ছাড়া দু'চারজন আধা-বিহারী আধা-বাঙালিবাবু কিংবা পাইকার।

এর মধ্যে ঐ চারজন যুবক একটুখানি নতুনত্ব, কেননা এই জায়গায় কখনো চেঞ্জাররা আসে না, সে-রকম কোনো ব্যবস্থাও নেই। ছোট্ট একটুখানি শহর-সাজা গ্রাম, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না—এমন ভাব, দু'চারখানা বাড়ি ফুরোতেই না ফুরোতেই শুরু হয়ে গেছে জঙ্গল। যুবক চারজনের বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, প্রত্যেকেরই সুঠাম স্বাস্থ্য, হাতে ভালো চামড়ার সুটকেস, হোল্ডঅল, টেরিলিন জাতীয় সুদৃশ্য পোশাক পরিহিত, ওদের মুখ-চোখ দেখলেই আর কারুকে বলে দিতে হয় না যে, ওরা কলকাতার মানুষ।

স্টেশন মাস্টার মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বেড়াতে এলেন বুঝি?

ওদের মধ্যে একজন প্যান্টের এ-পকেট ও-পকেট খুঁজছিল। পিছন পকেটের চামড়ার ব্যাগ থেকে বেরুলো ভাড়ার রসিদ, তখন সে জবাব দিলো, হ্যাঁ, সেইরকমই, দেখা যাক! আমাদের কাছে কিন্তু টিকিট নেই। মাঝরাত্রে টিটির কাছে ভাড়া দিয়ে এই রসিদ নিয়েছি। চলবে তো?

স্টেশন মাস্টার এক পলক উঁকি দিয়ে দেখেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই সময় এখানে বেড়াতে এলেন? আপনাদের তো অসুবিধে হবে...

— কেন, অসুবিধে কিসের; আপনার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না।

— থাকবেন কোথায়? এখানে তো—

— সে আমরা যা-হোক ব্যবস্থা করে নেবো।

ওদের মধ্যে আরেকজন বললো, কেন, এখানে একটা বাংলো আছে না? তাই শুনেই তো

এলাম।

—তা আছে, যদি জায়গা পান দেখুন, তাছাড়া খাবার-দাবারেরও অসুবিধে হবে।

—আপনি যদি খাবার-দাবার পান, তাহলে আমরা পাবো না কেন?

—কিচ্ছু পাওয়া যায় না এখানে স্যার! জংলীদের জায়গা, মাছ নেই, দুধ নেই, মাংসও সপ্তাহে দু'একদিন—আপনারা একটু আনন্দ-টানন্দ করতে এসেছেন—

ওদের মধ্যে যার সবচেয়ে দীর্ঘ চেহারা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, প্যান্টের পিছন পকেটে হাত, সে হা-হা করে হেসে উঠলো। বললো, কী করে বুঝলেন, আমরা আনন্দ করতে এসেছি? কলকাতায় কি আনন্দ কম?

আরেকজন এগিয়ে এলো, আপাতত আমরা অন্তত একটা আনন্দ পেতে চাই। এখানে চায়ের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা আছে কোথাও?

স্টেশন মাস্টার বিমর্ষভাবে বললেন, স্টেশনে কিছু নেই, এ লাইনটাই এ রকম, একটু এগিয়ে—কলকাতার মতন রেস্টুরেন্ট অবশ্য পাবেন না। তবে বাজারের মধ্যে দু'একটা চায়ের দোকান—

—বাজার কত দূরে?

—কাছেই, ঐ তো—

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওরা ওভারব্রিজে উঠলো। নরম সকালের হাওয়া আলগাভাবে খেলা করে গেল ওদের চোখে-মুখে-চুলে, ছানার জলের মতন আলো চারদিকে, ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা চার-পাশটা একবার তাকিয়ে দেখলো। ডান দিকে যতদূর দেখা যায় ঢেউ খেলানো মাঠ ও ছোট ছোট টিলা, বহুদূরে আবছা একটা পাহাড়, বাঁ দিকে জঙ্গল শুরু হয়েছে, জঙ্গল কেটে চলে গেছে রেললাইন—এইমাত্র ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটা এখনো অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। নতুন জায়গায় ঢোকার আগে ওরা যেন ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেছে। সামনেই বাজার, গোটা তিরিশেক পাকা বাড়ি একটু দূরে দূরে ছড়ানো, তারপর এক পাশে মাঠ এক পাশে জঙ্গল।

ওরা ঘুরে ঘুরে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকেই দেখলো। আর বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। একজন বললো, 'ধলভূমগড় নাম যখন, তখন একটু দুর্গ-টুর্গ থাকা তো উচিত। কোথায়, দেখতে তো পাচ্ছি না!

—জঙ্গলের মধ্যে ভাঙাচুরো কোথাও পড়ে আছে হয়তো।

মাথার ওপরের আকাশ গভীর সমুদ্রের মতন নীল। এক ছিটে মেঘ নেই। ওদের মধ্যে একজনের হাতে একটা পাকানো খবরের কাগজ ছিল, সে সেটা ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, বিদায়।

তার পাশের জন বললো, এই সঞ্জয়, কাগজটা ফেললি কেন?

—ধুৎ। খবরের কাগজের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাই না।

—ফেরার সময় জুতো মুড়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজে লাগতো।

—তখন দেখা যাবে। দে, সিগারেট দে।

খবরের কাগজটা হাওয়ায় দুলতে দুলতে নিচে লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল। কি একটা কাপড় না সিগারেট কোম্পানির আধপাতা জোড়া বিজ্ঞাপনের ছবিতে সুট-টাই পরা একজন লোভী লোকের হাত একটি শালোয়ার কামিজ পরা খুকির শরীর দোলাচ্ছে। ওভারব্রিজের রেলিং ধরে ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে একজন বললো, সঞ্জয়, ঐ ছবির ওপর ঠিক করে থুতু ফেলতে পারবি?

— ছেলেটার মুখে না মেয়েটার মুখে?

— তুই ছেলেটার, আমি মেয়েটার।

হাওয়ায় থুতু উড়ে যাচ্ছে, সোজা নিচে পড়ছে না। বিজ্ঞাপনের ছবি অম্লানই রইলো। বিরক্ত হয়ে একজন জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে মারলো। সেটাও কাগজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে চলে গেল কোথায়।

সবচেয়ে লম্বা যুবকটি বললো, এই, কি ছেলেমানুষী করছিস! তাড়াতাড়ি চল, চা না খেয়ে পারছি না!

ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটু দূরেই একটা বড় চাতাল। একটা বট গাছের নিচে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো অনেকখানি বেদি, সেখানে দশ-বারোটা আদিবাসী মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। তার ওপাশে কয়েকটা ছোট দোকান, ছোটখাটো বাজারের মতন। বাজারটায় যেন কোনো প্রাণ নেই, মানুষজনের ভিড়ে জমজমাট নয়। পটল ওজন করছে একটা লোক, কিন্তু কি রকম অলস তার ভঙ্গি, দুটো দিচ্ছে, তিনটে কমাচ্ছে, ওজন আর ঠিকই হয় না—তার সামনে দাঁড়ানো খদ্দেরটিরও যেন কোনো তাড়া নেই—সিনেমা দেখার মতন গভীর মনোযোগে দেখছে পটল মাপা। এক পাশে ডাঁই করা কতকগুলো কুমড়োর চূড়ার ওপর চুপটি করে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর।

মেয়েগুলো শুধু বসেছে আলাদা—এদের থেকে দূরে, পরিষ্কার উঁচু চাতালে। প্রত্যেকের কাঁখালে একটা করে ঝুড়ি, ঝুড়িতে করে কি বেচতে এসেছে তা দূর থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ওদের সামনে কোনো খদ্দের দাঁড়িয়ে নেই। সঞ্জয় বললো, অসীম, দ্যাখ তো ওদের কাছে ডিম আছে নাকি? তা হলে কয়েকটা ডিম কিনে নে, চায়ের সঙ্গে খেতে হবে তো।

অসীম ও আরেকজন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রে তোদের কাছে ডিম আছে! আণ্ডা?

পা ঝুলিয়ে বসা মেয়েগুলো এ-ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে মুখ টিপে হাসলো কেউ বা গ্রীবা সামান্য বেঁকিয়ে বাঁ দিকের কাঁধে মুখ গুঁজলো। কেউ কোনো উত্তর দিলো না।

— আণ্ডা মিলেগা? আণ্ডা হায় তুমরা পাশ?

মেয়েগুলো পূর্ববৎ তরঙ্গের মতন সবাই হাসিতে দুললো, পরস্পর গা ঠেলাঠেলি করলো, ওদের মধ্যে দু'একজন জলে ঘটি ডোবানোর মতন গুপ গুপ করে হাসলো, কিন্তু উত্তর দিলো না।

তখন পর্যন্ত ওরা ঐ মেয়েগুলো সম্পর্কে কোনোই ধারণা করে নেয় নি, নতুন জায়গায় এসে হাল্কা চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, কোনো ব্যস্ততা নেই। বাজারে ঢোকার আগে, এক কোণে বসা এই মেয়েগুলোকে চোখে পড়লো বলেই যেন কিছু জিনিস কেনার কথা মনে পড়েছে, জিনিসপত্র তো কিছু কিনতেই হবে—আর কিনতে হলে ময়লা ধুতি জড়ানো রুক্ষ দাড়িওলা দোকানিদের বদলে—এই হাসিখুশি সোমথ মেয়েগুলোর কাছ থেকেই কিছু কেনার কথা স্বাভাবিকভাবেই ওদের মনে আসে। দাম হয়তো একটু বেশি নেবে, তা হোক, সঙ্গে তো বাতাস-খুশি করা হাসি দেবে। শহুরে ছেলে সকালবেলা ডিম কেনার কথাই ওরা প্রথম ভেবেছে। ডিম না থাকে—মেয়েদের যে-কোনো সওদা, শিম-বরবটি কিংবা আলু-পেঁয়াজ যাই হোক—তাও হয়তো কিনবে।

অসীমরা এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর ঝুড়িতে উঁকি মারলো। কিছু নেই ফাঁকা ঝুড়ি সবারই ফাঁকা ঝুড়ি। ওরা একটু অবাক হলো। নীলপাড় শাড়ি পরা একটি কচি-মুখ মেয়েকে অসীম বললো কি রে, সব ফুরিয়ে গেছে? ডিম-টিম নেই কারুর কাছে?

মেয়েটি ঝংকারময় গলায় বললো, ডিম নেই তো দেখতেই পেছিস! অ্যাঁ!

— কিছু নেই তো এখানে বসে আছিস কেন?

— বসে আছি, হাওয়া খেতে মন লয়। তুহার তাতে কি?

অসীম বললো, আরে, এইটুকু লঙ্কার ঝাল তো কম নয়। দেখছি ঝগড়া করতে চাইছে। কী দোষ করলুম বাপু?—সে তার বন্ধুদের দিকে ফিরে বললো আশ্চর্য ব্যাপার মাইরি, এতগুলো মেয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে এমনি সকালবেলা বসে আছে!

আশপাশের দু'চারজন লোক কৌতূহলী হয়ে ওদের দেখছিল টেরা চোখে একটা হলুদ গেঞ্জি পরা ছোকরা ওদের দিকে ঘন হয়ে এসে শুনছিল ওদের কথা। সে বললো, উ মেয়েগুলো সব জন খাটে বাবু। ডিম বেচে না।

— জন খাটে মানে?

— রাজমিস্তির কাজে যোগান দেয়, ইট বয়।

— তা এখানে বসে আছে কেন?

— ইখানে বসে থাকে, যদি কারুর দরকার হয় তো ডেকে খাটাতে লিয়ে যার।

— ও বুঝলুম। তা এখানে আর প্রত্যেক দিন কী এত রাজ-মিস্তিরির কাজ হয় কে জানে। থাকগে তোমাদের এখানে ডিম পাওয়া যাবে?

— ডিম তো মিলবে না আজ, সেই হাটবার মঙ্গলবার।

— হাটবার ছাড়া আর ডিম পাওয়া যাবে না?

— যাবে, সে আপনার হোটেলে।

— ও, হোটেলও আছে এখানে? আচ্ছা রেস্ট হাউসটা কত দূরে?

— ওসব কিছু তো এখানে নাই বাবু।

— নেই মানে? আলবৎ আছে। ফরেস্ট রেস্ট হাউস।

— ফরেস্ট বাংলা? সে আপনার সেই দিকে জঙ্গলে।

— ঠিক আছে, এখোনে রিক্সা-টিক্সা পাওয়া যায়?

— আজ্ঞে না, রিক্সা ইদিকে কোথায় পাবেন, এসব জংলা জায়গা—বাবুরা তো কেউ আসে না তেমন, যারা আসে তারা মোটরে আসে—

লোকটির নাম লখা, তাকে ওরা তল্পিদার হিসেবে নিযুক্ত করলো। লোকটির কাঁধে কিছু মোটঘাট চাপিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো ওরা চারজন—সঞ্জয়, অসীম, শেখর এবং রবি। কাল রাত্তিরেই হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, সরু রাস্তায় প্যাচপ্যাচ করছে কাদা, দু'পাশে কয়েকটা মুদির দোকান, সিমেন্ট সুরকির আড়ত, নোংরা ভাতের হোটেল, একটা সেলুনও আছে, সিগারেটের দোকানে ঝ্যান ঝ্যান করে রেডিও বাজছে।

একটা দোকান বেছে নিয়ে ওরা বাইরের বেঞ্চিতে বসে গরম জিলিপি আর সিঙাড়া সঙ্গে চা খেলো। গেলাসের চায়ে কী রকম কাঁঠাল কাঁঠাল গন্ধ, এঁটো শালপাতায় এসে বসেছে নীল রঙের ডুমোডুমো কাঁঠালে মাছি। দোকানের বাকি লোকরা নিজস্ব কথা বলা থামিয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে। যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তাদের সকলেরই মুখভঙ্গি ব্যগ্র। ওরা চারজন অন্য কোনো দিকেই মনোযোগ দিলো না, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো, রেডিওর ফাটা আওয়াজটা খুবই বিরক্ত করছিল, অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো এগোই।

দু'চার পা হাঁটতেই বাজার শেষ হয়ে গেল, সরু রাস্তা এসে মিশলো বড় রাস্তায়। এখানে দু'চারটে ছড়ানো সুদৃশ বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ির সামনে কম্পাউন্ডে ফুল, লতা ও ইউক্যালিপটাস গাছ, শুধু এই জায়গাটুকু দেওঘর বা মধুপুরের এক টুকরো মনে হয়। লখা অনবরত বকবক করে যাচ্ছিল, কোনটা কার বাড়ি সেই বিবরণ, এই জায়গাটার অসংলগ্ন ইতিহাস-ভূগোল, ওরা সব কথা শুনছিল না, মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করছিল হঠাৎ। একটা বাড়ির দিকে ওদের সবারই

চোখ পড়লো, গোলাপি রঙা একটা সুন্দর বাড়ি, বাড়ির সম্পূর্ণ সীমানা দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তার ওপর ভাঙা কাচ ও কাঁটা তার বসিয়ে সুরক্ষিত, এক অংশে সবল লোহার গেট। গেটের পাশে একটা পুরোনো মরিস গাড়ি, একজন চাকর সেটা ধুচ্ছে। গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়, বাগানের মাঝখানে পাথরের পরী বসানো ফোয়ারা, বাগানের পথটুকু ব্যতীত বাকি অংশ ঘাসের বদলে লাল পর্টুলেকায় ছেয়ে আছে, যেন টুকটুকে লাল রঙের বাগান এক পাশে নেট খাটিয়ে দু'টি মেয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে, পালক দেওয়া কর্কের বদলে ওরা খেলছে রেশমের বল দিয়ে, মেয়ে দু'টি খেলছে আর ঝলমল করে হাসছে, বার-বারান্দায় ইজিচেয়ারে এক প্রৌঢ় খবর কাগজ নিয়ে ঝুঁকে বসা।

ওরা চারজন গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু'এক পলক মাত্র এই দৃশ্য দেখলো, পরস্পর চোখাচোখি করলো, রবি বললো, এখানে এক টুকরো বালিগঞ্জও আছে দেখছি। তবে যে শুনেছিলুম, এখানে জঙ্গল আর আদিবাসীরা ছাড়া কিছু নেই?

সঞ্জয় বললো, বড়লোকেরা কোথায় না আছে! তারা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

শেখর একটু চিন্তিতভাবে বললো, ওদের মধ্যে একটা মেয়েকে কী রকম যেন চেনা-চেনা মনে হলো।

রবি সঙ্গে সঙ্গে খোঁচা মারলো, বাজে গুল মারিস না! দুনিয়ার সব মেয়েই তোর চেনা। নতুন জায়গায় পা দিতে না দিতেই তোর চেনা মেয়ে? অ্যাঁ?

— হ্যাঁ, সত্যি বলছি, খুব চেনা না হলেও মনে হলো আগে কোথাও দেখেছি।

— আমার তো সব মেয়েকেই দেখে মনে হয় আগে দেখেছি, এজন্মে না হোক গতজন্মে। সে কথা বাদ দে।

— তা নয়, সত্যিই, মনে করতে পারছি না অবশ্য।

রবি বললো, চল ফিরে যাই, ভালো করে দেখে আসি তোর চেনা কিনা। তোর চেনা হলে আমারও চেনা হতে পারে!

তখন ওরা বাড়ির গেটটা থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে চলে এসেছে। শেখর বললো, যাঃ তা হয় নাকি, ফিরে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে তাকাবো? যদি সত্যিই চেনা না হয়?

রবি শেখরের একটা হাত ধরে টানাটানি করতে বললো, চল না, চল না, চেনা নাই-বা হলো, মেয়েরা বাগানে খেলছে তা দেখতে দোষ কি?

শেখর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো যাঃ।

অসীম জিজ্ঞেস করলো, লখা এটা কাদের বাড়ি?

— ইটা তো ত্রিপাঠী সাহেবের বাড়ি। খুব ভারী ব্যবসা ওঁয়াদের—কলকাতায় আপনাদের হাওড়াপাড়া আছে যে, সেখানে ওঁয়াদের—

অসীম মুখ ঘুরিয়ে শেখরকে প্রশ্ন করলো, কি রে, তুই ত্রিপাঠী পদবীর কোনো মেয়েকে চিনিস?

শেখরের মুখ দেখে মনে হয় তন্ন তন্ন করে সে ভেতরটা খুঁজছে। অন্ধকার রান্নাঘরে কালো জিরে খুঁজে না পেলে গৃহিণীরা যেমন এক একটা কৌটা খুলে গন্ধ শুঁকে দেখেন আর রেখে দেন, শেখরও সেইরকম আধ-চেনা প্রত্যেকটা মেয়েকে চোখের সামনে এনে প্রশ্ন করছিল, তুমি কি ত্রিপাঠী? না, না, গন্ধ মিলছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে অমলেশ ত্রিপাঠীর কাছে ইতিহাস পড়েছিলুম, দীপ্তি ত্রিপাঠীর লেখা বই ছিল তাপসের ঘরে, ভবানীপুরে ত্রিপাঠী অ্যান্ড সন্স নামে একটা রেডিওর দোকান আছে, না, আর কোনো ত্রিপাঠীর কথা সে শোনে নি। শেখরকে হার

মানতেই হলো।

ঐ বাড়িটা ছাড়বার পর আর দু'একটা এদিক ওদিক ছড়ানো খাপরার চালাঘর, তারপর রাস্তা ফাঁকা হয়ে এলো, এবার জঙ্গলে ঢুকবে, সামনেই জঙ্গল দেখা যায়। এই রাস্তাটা চাকুলিয়া হয়ে জামসেদপুরে চলে গেছে—তাই মাঝে মাঝে ট্রাকের আনাগোনা।

এপ্রিলের শেষে, রোদ্দুর এখনো বিরক্তিকর হয় নি, ঝকঝকে আকাশ থেকে রোদ এসে খেলা করছে বনে চূড়ায়। এই বন দেখলে গা ছমছম করে না, তরুণ শালগাছগুলোয় বল্লরী ধরেছে। বিশ্বাস করা যায় না ঐ কঠিন সব শাল বৃক্ষের এত সুন্দর নরম–রঙা ফুল। দু'একটা জারুল আর ইউক্যালিপটাসের ভেজাল থাকা সত্ত্বেও জঙ্গলটা এখানে পুরোপুরি শালেরই জঙ্গল। লালচে রাস্তা দিয়ে ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো।

বনের মধ্যে ঢুকেই ওদের অন্য রকম লাগলো। স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা আলাদা জগৎ। বনের ভিতরটা সব সময় নিঃশব্দ। আসলে অনেক রকম শব্দ আছে, কিচকিচে পাখির ডাক, হাওয়ার শোঁ শোঁ, লুকানো কাঠবিড়ালির চিড়িক চিড়িক, ঝিঁঝিঁর কোরাস, শুকনো পাতার খরখর, দূরে কোথাও কাঠ কাটার একঘেয়ে শব্দও ভেসে আসছে—তবু মনে হয় অরণ্য নিস্তব্ধ। ওসব শব্দ নিস্তব্ধতারই অলঙ্কার। জঙ্গলে ঢুকলে সত্যিকারের একটা বিশাল জিনিসকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়।

কালো পীচের চওড়া রাস্তা, দু'পাশে লাল সুরকি ছড়ানো—তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ওরা হাঁটছে। অসীমকে অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, শেখরও বন্ধুবান্ধবদের না বলে মাঝে মাঝেই হঠাৎ দু'এক মাসের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশে চলে যায়! ক্রিকেট খেলার জন্য রবি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরেছে, মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে একটা শিকারের পার্টিতেও গিয়েছিল একবার। সঞ্জয় একটু ঘরকুনো, কিন্তু বছরে একবার তাকে হরিদ্বারে যেতেই হয়। ওর বাবা সংসার ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে হরিদ্বারে আছেন, সঞ্জয় তার সঙ্গে দেখা করে আসে। অর্থাৎ ওরা চারজনেই আগে নানা জায়গায় ঘুরেছে, এই প্রথম ওরা দল বেঁধে একসঙ্গে বাইরে এলো। ওরা একসঙ্গে মিশেছে—কিন্তু সবকিছু মেলে নি, মাঝে মাঝে ওরা একসঙ্গে হাসি–ঠাট্টা করছে, মাঝে মাঝেই আবার অন্যমনস্ক, তখন চারজনে যেন চার রকম ভাবনায় অন্যমনস্ক।

বেশি হাঁটতে হলো না, আধ মাইলের মধ্যেই চোখে পড়লো ডাক–বাংলোর গেট, বাঁ দিকে চওড়া মোরাম বিছানো পথ, ভিতরে জাপানি ছবির মতন সাজানো বাড়িখানা। উঁচু সিমেণ্টের ভিতের ওপর বাড়ি, বারান্দার ঝুলন্ত টবে সাজানো রয়েছে নানা জাতের শৌখিন অর্কিড কয়েকখানা পরিচ্ছন্ন অটুট ইজিচেয়ার। বাড়ির সামনে কেয়ারি করা ফুল বাগান, একপাশে গাড়ি রাখার ছোট গ্যারাজ, তারও ওপাশে চৌকিদারের ঘর। ওদের দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলো, বাঃ! সত্যি চমৎকার জায়গাটা।

লখা মালপত্তর নামিয়ে রেখে, সমগ্র নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চেঁচাতে লাগলো, রতিলাল! রতিলাল—! এ—চৌকিদার!

কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। দূর থেকে শুধু সেই কাঠ কাটার অক্লান্ত শব্দটা একঘেয়েভাবে শোনা যাচ্ছে। সঞ্জয় বললো, দেখে মনে হচ্ছে এ জায়গায় বিশেষ লোকজন আসে না। চৌকিদার কি আর সব সময় থাকে?

লখা বললো, দাঁড়ান বাবু আমি ওকে ঢুঁড়ে লিয়ে আসছি।

— হ্যাঁ যাও, তাড়াতাড়ি দ্যাখো। চৌকিদার না আসা পর্যন্ত তোমার বকশিশ মিলবে না।

বকশিশের কথা শুনে লখা যেন চমকে উঠলো, যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিংবা এসব কথা

তার সামনে উচ্চারণ করাই উচিত নয়। অত্যন্ত লাজুকভাবে ঘাড় নুয়ে বললো, সে জন্য কি আছে হুজুর!

ওরা বারান্দায় উঠলো। চেয়ারে বসে হাত–পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো : রবি আর সঞ্জয় দু'দিকের বারান্দা ঘুরে তদন্ত করে এলো। রবি বললো, সত্যি খুব গ্র্যান্ড জায়গা, ট্রেনের সেই লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মাইরি।

অসীম বললো, লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে হতো। মনে হচ্ছে, সেও খুব রসিক লোক।

ওরা ছিল ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। মাঝ রাত্তিরে যখন চেকার ওঠে, ওরা বলেছিল, আমরা টিকিট কাটি নি কোথায় যাবো এখনো ঠিক করি নি।

— কোথায় যাবেন জানেন না তা হলে ট্রেনে উঠেছেন কেন?

— এমনিই শখ হলো। জানলা দিয়ে দেখছি—কোনো জায়গা পছন্দ হলে নামার সময় গার্ডকে ভাড়া দিয়ে দেবো।

—মাঝ রাত্তিরে জায়গা দেখছেন? তা বেশ! ট্রেনের আইনে তো ওসব চলে না। অন্তত টাটানগর পর্যন্ত টিকিট কাটুন এখন!

— টাটানগর গিয়ে কী করবো? বাজে জায়গা।

— কোথায় যাবেন তা–ই যখন জানেন না—

এই সময় ওদের পাশের লোকটি কথা বলে। লোকটি মধ্যবয়স্ক ঘন নীল–রঙা সুট পরে ছিল—হাতে সব সময় একখানা বই, প্রত্যেক স্টেশনে চা খাচ্ছিল। দেখে মনে হয়েছিল লোকটি অবাঙালি, এবার সে পরিষ্কার বাংলায় বললো আপনারা নিরিবিলিতে কোথাও ছুটি কাটাতে চান তো? আমি একটা জায়গা সাজেস্ট করতে পারি। ধলভূমগড়, বেশি দূর নয়। ঝাড়গ্রামের দু'স্টেশন পরেই।

রবি জিজ্ঞেস করেছিল কী রকম জায়গা বলুন তো?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল এতক্ষণ আপনাদের কথাবার্তা শুনে আপনাদের মেজাজটা বুঝেছি। ধলভূমগড়ে যান, আপনাদের ভালো লাগবে। আমি অনেকবার গেছি, খুব নিরিবিলি। রেস্ট হাউসে থাকবেন, কেউ বিরক্ত করবে না। আপনারা তো সেই রকম জায়গাই চান!

লোকটি ওদের সাহায্য করতেই চাইছিল, তবু গায়ে পড়ে পরামর্শ দিচ্ছে বলে ওদের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। রবি বলেছিল, আমরা কী রকম জায়গা চাই, তা আপনি কি করে বুঝলেন দাদা?

লোকটি সামান্য হেসে বলেছিল, বছর পনেরো আগে আমার বয়েসও আপনাদের সমান ছিল। আমার সেই সময়কার কথা ভেবে বললুম আর কি! আমরা সভ্য মানুষরা মাঝে মাঝে জঙ্গলে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাই। সেদিক থেকে ও জায়গাটা ব্রিলিয়ান্ট।

— আমরা কী রকম জায়গা চাই, তা অবশ্য ঠিক জানি না। আচ্ছা, ধলভূমগড়েই গিয়ে দেখা যাক।

এখন চেয়ারে পা ছড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে সঞ্জয় বললো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আগে থেকে রিজার্ভ না করলে ফরেস্ট বাংলোতে থাকা যায় না। বোধহয় গোলমাল করবে চৌদিকার এসে।

—ওসব কিছু না। দুটো টাকা একস্ট্রা দিলেই হবে।

—হবে কি না সন্দেহ।

দূরে দেখা গেল একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে লখা ফিরছে। শেখর বললো, সকলের একসঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। রবি, তুই চৌকিদারকে ট্যাক্‌ল কর।

রবির সু জোড়া নতুন, হাঁটলে গস্ গস্ শব্দ হয়, ফরসা মুখে ওর ঘন কালো জোড়া ভুরু—

বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। প্যান্টের হিপ পকেটে হাত দিয়ে রবি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল, অত্যন্ত অবজ্ঞা ভরে লখাকে জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটাই চৌকিদার নাকি?—কী নাম তোমার?

রবি লোকটার চোখে চোখ ফেলে প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলো। লোকটা এখনো সেলাম করে নি, রবির কাছে সেইটাই এখন সবচেয়ে বড় ব্যাপার। নিরীহ চেহারার মাঝ বয়স্ক লোকটা, সম্পূর্ণ খালি গা, তামাটে বুকের ওপর ঝুলছে মোটা পৈতে। লোকটা খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, কোনো অসমাপ্ত কাজ থেকে যেন হঠাৎ উঠে এসেছে। রবির চোখের দিকে সে তাকাচ্ছিল না, কিন্তু চোখে চোখ পড়লোই, সঙ্গে সঙ্গে সে সেলামের ভঙ্গিতে কপালের কাছে হাত তুলে দুর্বল গলায় বললো, হ্যাঁ, হুজুর। আমার নাম রতিলাল।

হঠাৎ অকল্পনীয় রবি প্রবল কঠোরতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অ্যাঁ? উল্লুক-কাঁহাকা; আধ ঘণ্টা ধরে বাইরে বসে আছি—দরজা তালাবন্ধ।

লোকটা ভয়ে একবারে কেঁপে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বললো, হুজুর, কারুর তো আসার কথা ছিল না।

— আসার কথা ছিল না মানে? সাতদিন আগে চিঠি দিয়েছি!

— হুজুর, কোনো খৎ তো পাই নি।

— খৎ পাও না পাও, তোমার ডিউটি এখানে থাকা। যাও, তাড়াতাড়ি দরজা খোলো।

লোকটা খানিকটা দম নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করলো, তারপর বললো, হুজুরের কাছে সিলিপ আছে? রিজার্ভ না থাকলে তো—

সে-সব পরে হবে, তুমি আগে দরজা খোলো। ফরেস্টারবাবু কোথায়?

—ফরেস্টারবাবু চাকুলিয়া গিয়েছেন, কাল বিকালে আসবেন।

—ঠিক আছে, ফরেস্টারবাবু এলে তাঁকে সিলিপ দিয়ে দেবো। এখন দরজা খুলে দাও।

—কিন্তু আমার ওপর অর্ডার আছে, স্লিপ না দেখালে তালা খুলতে মানা।

রবির মেজাজ এবার সপ্তমে পৌঁছুলো। সমস্ত মুখ বিকৃত করে সে বললো, আঃ, জ্বালালে দেখছি! এ-পকেট সে-পকেট খুঁজতে লাগলো রবি। বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, এর নামে রিপোর্ট করতে হবে। ডিউটির সময় আড্ডা মারতে যাওয়া! তারপর রবি পকেট থেকে কিছু একটা পেয়ে গেল—ট্রেনে চেকার ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে রসিদ দিয়েছিল—ধলভূমগড়ের স্টেশন মাস্টার যেটা দেখেই খুশি হয়েছিলেন—আর নিতে চান নি, রবি সেই কাগজটা মুড়ে চৌকিদারের দিকে ছুড়ে বললো, এই নাও! এবার খোলো—

শেখর, সঞ্জয় ও অসীম তখন অতি মনোযোগ দিয়ে নিজেদের হাতের পাঞ্জা দেখছে, কেউ পরীক্ষা করছে দেয়ালের চুনকাম, মুখগুলো কঠিন, যাতে কোনোক্রমে হাসি বেরিয়ে না পড়ে।

রতিলাল কাগজটা তুলে নিয়ে দেখলো। সব সরকারি কাগজই একরকম, সে কাগজটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চাবি বার করে দরজা খুললো। তারপর অতি ব্যস্ত হয়ে বললো, আমি টাঙ্কিতে এখনি পানি ভরে দিচ্ছি।

রবি বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিশ্বজয়ীর কণ্ঠস্বরে বললো, কি চলবে তো? চল ঘরগুলো দেখা যাক। এই লখা, মালপত্তরগুলো ঘরে তোল।

দু'খানা ঘর, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সঙ্গে বাথরুম। প্রত্যেক ঘরে দু'খানা করে খাট, ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের র‍্যাক, এমন কি শীতের জন্য ফায়ার প্লেস। ঘর দেখে ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটার কৃতিত্ব নেবার ভঙ্গিতে রবি মুখ প্রসন্ন করলো, তারপর রতিলালকে বললো, শোনো চৌকিদার ঝটপট চায়ের ব্যবস্থা করো। রান্নাবান্নাও করতে হবে। এখানে কী

কী খাবার পাওয়া যাবে?

রতিলাল বললো, হুজুর, আমি চা বানাতে পারবো। কিন্তু খানা পাকাতে আমি জানি না। আমার বহু উসব করতো, সাহেবরা তার রান্না খেয়ে কত খোস্ হয়েছেন, কিন্তু তার বড় বোখার। ডাগদরবাবুর পাশ গিয়েছিলুম, ডাগদরবাবু বললেন, সুই নিতে হবে।

—তাহলে তো মুশকিল। রান্না করবে কে? অসীম, তুই পারবি?

—দু'একবেলা চালিয়ে দেবো।

—ঠিক আছে, আজকের দিনটা তো চলুক। চৌকিদার, তুমি বাথরুমে জল তুলে দাও, চা করো, আর জিনিসপত্র কিনতে হবে, চাল, আলু, আর এখানে মুর্গী পাওয়া যাবে তো?

—মুর্গী তো সেই হাটবার।

—ভাগ্, সবই শুধু হাটবার ! গ্রামের মধ্যে মুর্গী পাওয়া যাবে না?

লখা বললো, আমি মুর্গী যোগাড় করে দুবো বাবু। ভালো মুর্গী, দুবলা-ফুবলা নয় নিজের ঘরের।

—ঠিক আছে, এই লোকটাকে দিয়েই জিনিসপত্র আনানো যাক। চৌকিদার, তুমি একে চেনো তো? এ টাকা পয়সা নিয়ে পালালে তুমি জামিন রইলে।

লখাকে টাকা আর জিনিসের লিস্ট দিয়ে পাঠানো হলো। রতিলাল গেল জল তুলতে। ওরা এবার জুতো-জামা খুললো, সুটকেস থেকে বেরুলো টাটকা গেঞ্জি আর পা-জামা। অসীমের সুটকেসের এক কোণে উঁকি মারলো একটা ব্রান্ডির বোতল। রবি একটু ছটফটে, সে চটি জুতো খুঁজে পাচ্ছে না, তার ধারণা বেডিং-এর মধ্যেই রেখেছিল, সেখানে নেই। সুটকেস হাঁটকেও না পেয়ে রবি পুরো সুটকেসটাই উলটে দিলো। চটি জুতো আনতে সে ভুলেই গেছে, কিন্তু তার জিনিসপত্রের মধ্যে সবার চোখে পড়লো একটা খাপসুদ্ধ বড় ছোরা। অসীম বললো, আরে, দারুণ জিনিসটা তো !

অসীম সেটা তুলে নিয়ে খাপ থেকে ছোরাটা বার করলো। খাঁটি স্টিলের ন'ইঞ্চি ফলা, ঝকঝক করছে। জিজ্ঞেস করলো, এটা এনেছিস কেন?

রবি বললো, রেখেছি সঙ্গে—যদি কাজে লাগে।

অসীম বললো, এত বড় ছোরা সঙ্গে থাকলেই কাজে লাগাতে ইচ্ছে করে। ডেঞ্জারাস !

রবি তাকে তাড়া দিয়ে বললো, নে নে যা, চট করে আগে চান করে নে, আবার রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে !

টুথ ব্রাস, টুথ পেস্ট, তোয়ালে নিয়ে দু'জন ঢুকলো বাথরুমে। শেখরই শুধু পুরো পোশাকে অলসভাবে বসে রইলো চেয়ারে। জুতোও খোলে নি। একটু একটু পা দোলাচ্ছে, ওদের কথার দিকে মন নেই। একমনে সিগারেট টানতে লাগলো, একটা হাত তার মাথার চুল নিয়ে খেলা করছে।

রবি বললো, কি রে শেখর তুই জামা-কাপড় ছাড়লি না?

—দাঁড়া, এই সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—মুখখানা অমন উদাস কেন? ও বাড়ির সেই মেয়েদের কথা ভাবছিস বুঝি?

—কোন বাড়ির?

ঐ যে আসবার সময় দেখলুম, ত্রিপাঠীদের বাড়ির সুন্দরীরা, তোর চেনা-চেনা—

—যাঃ, ও কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

—তাহলে, এমন চুপচাপ !

—বাঃ, চুপচাপ নিরিবিলিতে কাটাবার জন্যই তো এখানে এলাম।

—দাঁড়া না, নিরিবিলি বার করছি। একেবারে নরক গুলজার করে তুলবো।

২

জঙ্গল অথচ ঠিক জঙ্গলের মতন নয়। যতদূর দেখা যায়, ঘন গাছের সারি, কোথাও কোথাও ঘন পাতার আড়ালে নিবিড় ছায়া, কিন্তু যে-জঙ্গলে হিংস্র-জন্তুজানোয়ার নেই, সেটাকে তো অরণ্য না বলে বাগান বললেও চলে। লখাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল, লখার মুখেই শুনলো, না, বাঘ-টাঘের কোনো ভয় নেই এখানে। মাঝে মাঝে দু'একটা নেকড়ের দেখা পাওয়া যায়, সেও খুব কম। বছর তিনেক আগে নাকি এক জোড়া ভাল্লুকের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং তাদের আর সন্ধান নেই। রাত্তিরেও এ জঙ্গল দিয়ে অনেকে চলাফেরা করে, হাতে একটা লাঠি থাকলেই যথেষ্ট।

কিছু কিছু শাল গাছ বেশ কচি, মনে হয় সরকারী অ্যাফরেস্টেশন প্ল্যানে বছর কয়েক আগে লাগানো, নবীন যুবার মতন তাদের ছিপছিপে দেহ। মোটকথা, বনটা বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝুপসি ডালপালা কিংবা লতা-ঝোপের বিশেষ বাধা নেই, খুব সহজভাবে হাঁটা যায়।

প্রথম প্রথম জঙ্গল সম্বন্ধে ওরা চারজন নানারকম কৌতূহল জানাচ্ছিল, একটু পরে সে-সব নিবৃত্ত হলে অরণ্যের আচ্ছন্নতা ওদের অধিকার করলো। ওরা চুপচাপ হাঁটতে লাগলো, শুকনো পাতায় ওদের ভারী পায়ের আওয়াজ শুধু। সরু সরু পায়ে চলা পথ পেরিয়ে পেরিয়ে ওরা এলো বড় রাস্তায়, জঙ্গল কেটে সেই রাস্তা বেরিয়ে গেছে, চওড়া ফাঁকা রাস্তা, তার একপ্রান্তে খুব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাতলা পাতলা মেঘ ফাটিয়ে সূর্য ছড়াচ্ছে তার রাশি রাশি গাঢ় লাল রং, গাছের চূড়ায় সেগুলো পৌঁছাতে পৌঁছাতে হয়ে যাবে সোনালি, খুব একটা শেষ রঙের খেলা চলছে। এ ধরনের জমকালো সূর্যাস্ত তো আজকাল মানুষ সচরাচর দেখে না, এসব এখন শুধু দেখা যায় সিনেমায়, সুতরাং ওদের পশ্চিমী সিনেমার কথাই মনে পড়লো, রবি বললো, মনে আছে, গার্ডেন অব ইডেন-এ বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার?

অসীম বললো, ভাগ, ও বইতে বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার ছিল না, গ্যারি কুপার আর রিচার্ড উইডমার্ক, আর সেই পাছা দোলানো মেয়েটা যেন কে ছিল?

সিনেমার খবর সঞ্জয়ই বেশি রাখে, সে হেসে জানালো—মেয়েটা ছিল আভা গার্ডনার, বুক আর পাছা একসঙ্গে দোলায়, কিন্তু গ্যারি কুপার ছিল না, গ্রেগরি পেক।

রবি বললো, ছবি তুললে অনেক কিছুই ভালো দেখায়। এখানে এই সান-সেট্‌টার ছবি তুললে—হলিউডের এইসব সিনের থেকে কিছু এমন খারাপ হতো না। ক্যামেরাটা আনলেই হতো। শেখর শুধু শুধু বারণ করলি—

শেখর বললো, না, না ওসব দামি জিনিস সঙ্গে নিয়ে এরকমভাবে বেড়াতে বেরুনো যায় না। সব সময় ভয় থাকে—এই বুঝি হারালো। সঙ্গে ওসব না থাকলে কিছু হারাবারও ভয় থাকে না।

একটা বেশ প্রশস্ত সিমেন্টের কালভার্ট। ওরা বসলো তার ওপর। লখা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আস্তে আস্তে আলো কমে এসে, প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নামলো, তারপর রাস্তার ওপরেও পড়লো কালো ছায়া।

শেখর সিগারেটটা ছুড়ে ফেললো, বললো, এখন কী করা যায় বল তো?

রবি বললো, তাস এনেছিস?

—না, তাস-ফাস নয়। জঙ্গলে তাস খেলার জন্য আসি নি।

—তা হলে কি করবি? সময় কাটাতে হবে তো?

অসীম বললো, ভাবতে হবে না, দেখিস, আপনিই সময় কেটে যাবে। আমি তো ঠিক করেছি, যে ক'দিন এখানে থাকবো জঙ্গল থেকে বেরুবো না। শহর ছেড়ে এখানেই কাটাবো। তা ছাড়া ঐ তো নোংরা শহর, ওখানে গিয়েই বা লাভ কি?

শেখর নিচু হয়ে দুটো পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিলো, একটা শূন্যে সামনে ছুড়ে দিয়ে বললো, আমিও তাই ভাবছি। দ্বিতীয় পাথরটা পড়লো ডান দিকের জঙ্গলে, হঠাৎ সেখানে কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। ওরা চমকে সবাই ঘুরে তাকালো।

টর্চ ছিল রবির হাতে। সেই দিকে আলো ফেললো। দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা নির্জন বাড়ির আভাস। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা ভাঙাচুরো বাড়ি, কোনোটারই দরজা-জানলা নেই, ভিতরে আবর্জনা, ভাঙা কাচ, ছেঁড়া বিছানা, সাপের খোলস—দেখলেই বোঝা যায়, এক কালে মিলিটারির আস্তানা ছিল। লখাও সেই কথা জানালো। তার মনে আছে, ছেলেবেলায় এখানে গোরা সাহেবেরা থাকতো, তার মা সেইসব সাহেবদের গল্প এখনো বলে। কি দরাজ দিল ছিল সাহেবদের—। সাহেবরা চলে যাবার পর বাড়িগুলো এমনিই পড়ে আছে। দু'একটা ঘর একটু পরিষ্কার, মনে হয়, কিছুদিনের মধ্যেও লোক ছিল এখানে। অরণ্যে কে কোন প্রয়োজনে ভাঙা বাড়ি ব্যবহার করে কেউ জানে না।

বাড়িগুলো দেখে খুশি হয়ে শেখর বললো, বাঃ, আমরা তো এখানেও থাকতে পারতুম। ডাকবাংলোয় জায়গা না পেলেও এমন কিছু অসুবিধে হতো না।

—যাঃ, ছাদ ভাঙা।

—তাতে কি হয়েছে, এখন মার্চ মাসে বৃষ্টি পড়বে না, শীতও কমে গেছে। যাক, বাড়িটা দেখা রইলো, পরে কাজে লাগতে পারে।

—অমন চমৎকার বাংলো পেয়ে গেছি, এটা আর কি কাজে লাগবে? অসীম বললো।

—দেখা যাক।

—একটা বন্দুক আনলে হতো, পাখি-টাখি মারা যেতো।

অসীম তোদের তো রাইফেল ছিল একটা, আনলি না কেন?

—কোথায় রাইফেল, গত যুদ্ধের সময় বাবা তো হুজুগে পড়ে ওটা ডিফেন্স ফান্ডে দান করে দিলেন। মাত্র দু'দিনের জন্য—

অসীমের গলায় আফসোস ফুটে উঠলো। কেননা, যুদ্ধের হুজুগে বেহালায়, অসীমদের পাড়ায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ডিফেন্স ফান্ডের জন্য মিটিং করেছিলেন, তখন পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে অসীমের বাবাও উপস্থিত ছিলেন এবং পাঁচজনের কথা শুনে ঝোঁকের মাথায় তিনি নিজের বন্দুকটাই দান করে ফেললেন। বন্দুকের বাঁটে ওর বাবার নাম খোদাই করা, সেই দশ বছরের পুরোনো রাইফেল কোন যুদ্ধে কাজে লাগাবে কে জানে, অসীমরা সবাই আপত্তি করেছিল, কিন্তু ওর বাবা শোনেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধ-বেঁকানো হাসি ও জনতার হাততালির লোভ সামলাতে পারেন নি। এবং তার ঠিক দু'দিন পরেই অসীমের বাবা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যান এবং সেই রাত্রেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। পিতার মৃত্যুর জন্য দুঃখিত অসীমের আফসোস শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই মরলেনই যখন বাবা আর দু'দিন আগে মরলেই রাইফেলটা বাঁচতো।

শেখর বললো, রাইফেল আনলেও আমি শিকার করতে দিতুম না। পাখি মারা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

রবি হেসে উঠলো। সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, একটা জিনিস লক্ষ করেছিস? শেখর কি রকম নিজে নিজেই লিডার হয়ে গেছে? সবকিছু ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী চলবে। ভাগ্!

শেখর বললো, না, লিডার কেউ নয়। কিন্তু একটা জিনিস মানতে হবে। কোনো একটা জিনিস আমাদের একজনের খারাপ লাগলে, বাকিদের সেটা করা চলবে না। না হলে সব মাটি হয়ে যাবে!

—তা হয় না। বরং, এইটা ঠিক কর, কেউ কারুর কাজে বাধা দেবে না। আমি কখন কি করবো, তার কোনো ঠিক নেই। বাইরে এসেছিই একটু প্রাণ খুলে যা-খুশি করতে।

শেখর এবার যথার্থ দলপতির মতনই ভারী গলায় বললো, রবি আজ বাংলোয় তোর ছুরিটা আমাকে দিয়ে দিবি।

—কেন ?

—আমার দরকার আছে।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা মৃদু গন্ধ আসছিল, আর কিছুক্ষণ পথ পেরিয়ে এসে এবার কিছু লোকের কথার আওয়াজ ও দু'এক বিন্দু আলো দেখা গেল। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়লো, নিম গাছের তলায় কয়েকটি চালাঘর, এখানে জঙ্গল ফাঁকা, ঝাঁপ তোলা এক দোকানে আলুর দম আর ছোলা সেদ্ধ বিক্রি হচ্ছে, পাশের দোকানটির সরু রকে ও মাটিতে বহু মেয়ে-পুরুষ বসে আছে, হাতে লাল রঙের বোতল ও পাতার ঠোঙা। জায়গাটার নির্ভুল চেহারা, তবু অসীম জিজ্ঞেস করলো লখা এখানে, কি হচ্ছে?

—উসব ছোটলোকের জায়গা বাবু, মহুল খাচ্ছে সব।

—মহুয়া? তাই গন্ধটা পাচ্ছিলুম। শেখর, একটু চেখে দেখবি নাকি?

—নিশ্চয়ই।

রবি সব কিছু জানে, সে বললো, জানতুম এখানে মহুয়া পাওয়া যাবেই। এসব ট্রাইবাল পকেটে মহুয়া ছাড়া।

পুরো দলটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যেন তারই, রবি এগিয়ে গেল এবং দেখে আশ্চর্য হলো, জঙ্গলের মধ্যে দোকান, কিন্তু পুরোদস্তুর লাইসেন্সড্। সামনে সরকারি বিজ্ঞপ্তি টাঙানো, তাতে বিভিন্ন বোতলের দাম ও দোকান খোলা-বন্ধের সময় জানানো। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রবি দরাজ গম্ভীর গলায় এক নম্বরের দু'বোতলের অর্ডার দিলো।

লোকজনরা ওদের দেখে কিছুটা তটস্থ হয়ে উঠেছে। সারা জায়গাটা জুড়ে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ছিল—হঠাৎ সেটা থেমে গেল। অনেকগুলো চোখ এসে পড়লো ওদের ওপরে। একসঙ্গে একরকম চারজন বাবুকে এখানে কখনো দেখতে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকদের কাছে এসব জিনিস অস্পৃশ্য দু'একজল খেলেও চাকরকে দিয়ে কিনতে পাঠায়, কিন্তু এরা একেবারে সশরীরে। একটা বুড়ো সাঁওতাল মাতলামি করছিল, সে পর্যন্ত মাতলামি থামিয়ে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। মেয়েরা অনেকে পেছন ফিরে বসলো, একটি যুবতী মেয়ে তার অচৈতন্য মরদকে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল, সে শুধু ফচকে গলায় বলে উঠলো চল মুংরা, পুলিশ আ গেলন্, আভি তুহাররে পাকড় লে যাই-ই—।

রক থেকে কয়েকজন নেমে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিয়েছিল, রবি গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে সবটা শেষ করে বললো, বেশ জিনিসটা তো। স্ট্রং আছে। অসীম, তুই একটু কম কম খাস।

অসীম বললো, আমার এসবে কিছু হয় না।

কিন্তু অসীমের গেলাস ধরার কায়দা দেখেই বোঝা যায়—সে জিনিসটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। গায়ে চুমুক দেবার মতন আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে। কষা স্বাদে মুখে একটুখানি বিকৃত হয়ে এলেও বন্ধুবান্ধবের সামনে প্রকাশ করতে চাইছে না।

রবি তো সব জানে, অসীমকে উপদেশ দেবারও অধিকার তার আছে। বললো, মহুহা জিনিসটা দেখতে এ রকম সাদা জলের মতন—কিন্তু হঠাৎ কিক্ করবে। জিনের বাবা।

শেখর চারদিক চেয়ে লোকগুলোকে দেখছে। সবাই তখনো ঝিঁক চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কেউ কথা বলছে না। শুধু সেই মাতাল মেয়েটা সব কিছু অগ্রাহ্য করা গলায় তীক্ষ্ণভাবে বলতে লাগলো, এ মুংরা, পুলিশ আভি তুহারকে পাকড় লে যাই-ই, এ মুংরা...।

রবি এক পলক তাকিয়ে দেখলো ওদের দিকে। তারপর গলা চড়িয়ে মেয়েটাকে বললো, ওকে একা কেন, তোদের দু'জনকেই ধরে নিয়ে যাবো।

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, যাবি তো চল না। আমি নাচ দেখাবো। আর সালে থানায় গিয়ে সারা রাত নাচ দেখাইছি। বড়বাবু পাঁনচো রুপিয়া দিলো, হি-হি-হি?

সঞ্জয় বললো, একটা জিনিস দেখেছিস, এরা বাংলা—হিন্দি দুটোই বেশ জানে। বাংলা তো সব বুঝতেই পারে—

রবি বললো, এসব সিংভূম জেলার জায়গা তো, আগে বাংলাদেশেই ছিল, আগে তো এখানে বাংলাই বলতো।

মেয়েটির নেশা প্রচুর, নিজের মরদের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা ছেড়ে সে দুলতে দুলতে ওদের কাছে এগিয়ে এসে বললো, এ বাবু, আমাকে একটু খাওয়াবি? এই টুকুনি, আধ পোয়া?

রবি প্রচণ্ড ধমকে উঠলো, ভাগ্ ! যা এখান থেকে !

দু'তিনটে মাতাল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, হ্যাঁ, গলার জোর আছে, পুলিশই বটে মনে হয়—

রবি শুনতে পেয়েছিল সে কথা, উত্তর দিলো, হ্যাঁ, ঠিকই মনে লয়—বেশি গোলমাল করো না।

শেখর নিম্নস্বরে রবিকে বললো, ওরকম ধমকে কথা বলিস নি ! এদের সঙ্গে বরং বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করা ভালো।

—ধমকে কথা না বললে এরা লাই পেয়ে মাথায় উঠবে।

তা বলে ওরকম ভয় দেখাস নি। এদের সঙ্গে বসে এদের সঙ্গে এরকমভাবে মিশে যাওয়াই ভালো। তাতেই বেশি মজা। শুধু শুধু বাবু সেজে আলাদা হয়ে থাকার মানে হয় না।

শেখর পাশের একটি লোককে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ভাই।

লোকটি কোনো কথা বললো না। আস্তে আস্তে নিজের বোতলটি সঙ্গে নিয়ে উঠে গিয়ে দূরে এক জায়গায় বসলো। রবি অট্টহাসি করে উঠলো ভাই? শেখরটা একটা ড্যাম রোমান্টিক। ভাই বলে তুই এদের সঙ্গে মিশবি? তুই কোতারি না শুনলেই ওরা ভয় পায়। দেখবি কি করে এদের সঙ্গে কথা বলতে হয়?

রবি আরেকটি লোকের দিকে চেয়ে বললো, এ মাঝি, তোর গাঁও কোথায় রে?

লোকটি উত্তর দিলো ঠিকই, কিন্তু একটু উদাসীনভাবে, বললো সেই সেদিকে, লতাডিহি।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু'ক্রোশ হবে।

— তোমার গ্রামে মুর্গী পাওয়া যায় ?

—মুর্গী তো হাল দুনিয়ায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়।

বোঝা গেল, লোকটা কথা চালাতে বিশেষ উৎসাহিত নয়। কেননা, সেও এবার উঠে বোতল জমা দিয়ে, লাঠিটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের পথে রওনা দিলো। সঞ্জয় বললো, এদের সঙ্গে ভাব করা সহজ নয় ? জোর করে চেষ্টা করেই বা কি লাভ?

রবি জিজ্ঞেস করলো, সঞ্জয়, তুই খাচ্ছিস না?

—না। আমার নেশা করতে ভয় করে।

—ঠিক আছে। আমাদের বেশি নেশা হয়ে গেলে কিন্তু তুই দেখবি।

লখা এবার লজ্জিত ও বিনীতভাবে জানালো, আমাকে একটু বাবু !

রবি কিছু বলার আগেই শেখর বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে একটু দাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবি হাতের বোতল থেকে লখাকে পাতার ঠোঙায় ঢেলে দিলো, তারপর ইংরাজিতে বললো, যাক, তবু শেখর এদের মধ্যে একজন অন্তত বন্ধু পেয়েছে। কিন্তু লখা, তুই দুপুর বেলা মুর্গীর বড় বেশি দাম নিয়েছিস। বেশি চিটিং করার চেষ্টা করলে কিন্তু তার ঠ্যাং ভাঙবো ! ভেবেছিস কলকাতার বাবু—মাল চেনো নি এখনো !

রবি কাছ থেকে আকস্মিক বকুনি খেয়ে লখা হতচকিত হয়ে যায়। কিন্তু বাবুর হাতে মদের গ্লাস থাকলে সেই সময় তর্ক করতে নেই—এ কথা সে ভালোভাবে জানে, তাই কোনো উত্তর না দিয়ে সে অপরাধীর মতন মাথা নিচু করলো।

রবিরই প্রথম নেশা হয়। তার তেজী শক্তিমান শরীরটা ছটফট করে। সে উঠে দল ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়, একে-ওকে বকুনি দেয়। দোকানের মালিককে তার লাভ-লোকসান বিষয়ে প্রশ্ন করে। শেখর বেশি কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে, জঙ্গলের মাথায় দল বেঁধে অন্ধকার নামা দেখে। তার মনে পড়ে, গতকাল এই সময় সে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে। জিনিসপত্র গোছাবার সময় সে টের পেয়েছিল তার ছাড়া শার্টের পকেটে চিঠি ছিল—বাড়ির লোক সেই চিঠি সমেতই শার্টটা কাচতে পাঠিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিঠি। তাই নিয়ে রাগারাগি, মাকে সে বলেছিল... হঠাৎ শেখরের খেয়াল হলো, এখানে এই ক'দিন সে কলকাতার কথা একবারও মনে করবে না ঠিক করেছে !

সাড়ে সাতটায় দোকান বন্ধ, আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে এলো। সেই মেয়েটা এর-ওর কাছে মদ ভিক্ষে চেয়ে তাড়া খাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। সে নিজে নেশায় টলছিল, কিন্তু একটু পরেই সে তার অজ্ঞান মরদকে কাঁধে নিয়ে অবলীলাক্রমে বনের অন্ধকারে মিশে গেল।

সঞ্জয় অল্প হেসে বললো, এদের সঙ্গে সাহেবদের খুব মিল কিন্তু।

অসীম বললো, হ্যাঁ, এরা বেশিরভাগই ক্রিশ্চান।

—না, সেজন্য নয়। দেখছিস না—সাহেবদের মতই—মেয়েদের কোনো আব্রু নেই, মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে, সামান্য ছোট-খাটো উৎসব হলেই এরা মেয়ে-পুরুষে হাত-ধরাধরি করে নাচে, মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার—ঠিক ওয়েস্টার্ন সোসাইটি।

রবি হেসে উঠে বললো, তুই খেলি না তো, তাই তোর এসব ভালো ভালো কথা মনে পড়েছে। খা না একটু !

—না। সঙ্গে নিয়ে চল, বাংলোয় বসে খেয়ে দেখবো।

—এখানে খাবি না কেন?

—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতে হবে তো—সকলের নেশা হলে মুশকিল !

—তাও হিসেব করে রেখেছিস ! হিসেবগুলো একটু ভুলে যা না একদিন। জঙ্গলের মধ্যে ফিরলে কি হবে? রবি চৌধুরী সঙ্গে আছে, কোনো ভয় নেই।

ফেরা-পথের দৃশ্য অন্যরকম। জ্যোৎস্নায় সমস্ত বন ধুয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর এক প্রান্তে এখন সত্যকার নিস্তব্ধতা। রবির বেশি নেশা হয়েছে, সে স্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ইংরিজি গান গাইছে দীর্ঘ গলায়; হঠাৎ গান থামিয়ে উৎফুল্লভাবে দাবি জানালো, আয় সঞ্জয়, তো'তে-

আমাতে নাচি।

—দেখবি, নাচবো দেখবি ?

ফাঁকা রাস্তায় অসীম খানিকটা ছুটে এগিয়ে গেল, তারপর ওদের দিকে ফিরে টুইস্ট নাচতে লাগলো। সেই জ্যোৎস্নায়, দু'পাশে নীরব বৃক্ষ দর্শক, চওড়া রাস্তায় অসীমের আবছা মূর্তিটা খানিকটা অলৌকিক দেখাতে লাগলো, রবি ওর নাচে সুর দিচ্ছে।

শেখর হাততালি দিয়ে তাল দিতে দিতে বললো, আঃ, খুব ভালো লাগছে রে। তুই ঠিক বলেছিস অসীম, এই জঙ্গল থেকে আর বাইরে যাবো না ! এখানে যে ক'দিন আছি, জঙ্গলের মধ্যেই থাকবো, আর মহুয়া খাবো।

পরের দিনই ওদের অবশ্য একবার শহরে যেতে হলো। প্রথমদিন ঠাণ্ডা কুয়োর জলে স্নান করার পর সঞ্জয়ের একটু সর্দি লেগেছে—ওষুধ কেনা দরকার। নেশা করলে পরের দিন ভোরে অসীমের মাথা ধরে—তার অ্যাসপিরিন লাগছে। তা ছাড়াও ওদের খেয়াল হয়েছিল ওরা কেউ চিরুনি আনে নি, একজন কেউ আনবেই—এই ভেবে কেউই নিজে চিরুনি আনে নি। রবির চুল চাপ বাঁধা, কোঁকড়ানো, তার চিরুনি না থাকলেও চলে, শেখরের স্বভাব যখন-তখন বাঁ হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চিরুনির মতন চালানো, কিন্তু অসীম ও সঞ্জয়ের চুল অবাধ্য বিশেষত সঞ্জয় যথেষ্ট শৌখিন প্রকৃতির যতবার সে মুখ ধোয়—ততবারই চুল আঁচড়ে নেওয়া তার চাই, সুতরাং চিরুনি একটা দরকারই।

খবরের কাগজ পড়ার ইচ্ছে অবশ্য কারুরই নেই, কিন্তু মাদ্রাজ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ইন্ডিয়া হারলো কি জিতলো, সে খবরটা অন্তত না জানলে চলে না। তা ছাড়া, সকালবেলা চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ খাওয়া বহুদিনের অভ্যাস, দু'দিন ডিম না পেয়ে ওরা উসখুস করছে। অসীমের মত এই যে, রান্না নিয়ে বেশি ঝঞ্ঝাট করার মানে হয় না বটে, কিন্তু গরম ভাতের সঙ্গে খানিকটা মাখন পেলে যে-কোনো জিনিসই সুখাদ্য হয়ে উঠবে। একটা মাখনের টিন কিনলে খুব ভালো হয়। সিগারেটেরও স্টক রাখা দরকার।

চৌকিদার রতিলালের বউয়ের খুব অসুখ, সে লোকটা খুব বিব্রত হয়ে আছে। উনুন ধরাচ্ছে, চা বানিয়ে দিচ্ছে, বাথরুমের ট্যাঙ্কে জল ভরছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝেই সে রেললাইনের ওপারে নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। লখা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে সব সময়, যে-কোনো হুকুম তামিল করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু রবির ধারণা লোকটা বড্ড বেশি চোর, ওকে দিয়ে সব জিনিস আনানো উচিত নয়।

ডাকবাংলোর পেছন দিকে ফাঁকা মাঠ, সেখান দিয়ে বাজার ও স্টেশন সর্ট-কাট হয়। চা খাবার পর কিছুক্ষণ আলস্য করে, ওরা সবাই শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। যার যা দরকার একেবারেই কিনে আনা ভালো। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম অবশ্য ওরা সবাই এনেছে, কিন্তু আজ সকালে দাড়ি কামাবার ইচ্ছে কারুরই দেখা গেল না। এই জঙ্গলের মধ্যে আর কে দেখতে আসছে—দরকার কী ওসব ঝামেলার। সঞ্জয় অবশ্য নিজের ধারালো গালে দু'একবার হাত বুলালো, কিন্তু চুল আঁচড়ানোই যাচ্ছে না যখন—

আবার সেই নোংরা বাজার, রেডিওর চিল্লানি, হোটেলের ভালো-ভালো গন্ধ। সেইসব কৌতূহলী চোখ, নীল ডুমো ডুমো মাছি। রাস্তার কাদা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে বহু মানুষের পায়ের ছাপ আঁকা।

টিনের মাখন পাওয়া গেল না—অতিরিক্ত হলদেটে রঙের স্থানীয় মাখন কিনতে হলো—অত্যন্ত বেশি দাম দিয়ে। চিরুনি জুটলো প্লাস্টিকের সস্তা চিরুনি। একটা দোকান থেকে দশ প্যাকেট সিগারেট কিনতে—সে দোকানের সব সিগারেটই শেষ হয়ে গেল। চটের থলেতে বিছিয়ে গুচ্ছের আলু-পেঁয়াজ-কুমড়ো-পটল নিয়ে বসেছে দু'একজন, কিন্তু ডিমের কোনো দেখা নেই। মঙ্গলবারের হাট ছাড়া ডিম অসম্ভব। একটা হোটেলের সামনে তারের ঝুড়িতে ডিম ঝোলানো রয়েছে, কিন্তু সে ডিম আলাদা বিক্রি হবে না, সুতরাং ওরা সেখান থেকেই চারটে ডিম সিদ্ধ খেয়ে নিলো। বেশ বোঝা যাচ্ছে, জঙ্গলের শান্ত আবহাওয়া ছেড়ে এই নোংরা বাজারে এসে ওরা কেউ খুশি হয় নি। তবু, তৎক্ষণাৎ ফিরে যাবার পক্ষেও একটা কিছু অতৃপ্তি রয়ে যাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা চলে এলো স্টেশনের পাশে। সেই বটগাছ তলার বাঁধানো বেদিতে আজও দশ বারোটা সাঁওতাল মেয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। পরস্পর জটলা ও হাসাহাসি করছিল, ওদের দেখে থেমে গেল। অসীম বললো, আশ্চর্য দেখ, এখন প্রায় দশটা বাজে, আজও ওরা এখানে বসে আছে। কে ওদের কাজ দেবে বুঝতে পারি না।

রবি জবাব দিলো, সবাই কি আর কাজ পায়, হয়তো দু'একজন কাজ পায়।

— কাল ভোরবেলা যে-ক'জন দেখেছিলাম, আজ এত বেলাতেও তো প্রায় সেই ক'জন দেখছি!

— তুই গুণে রেখেছিলি বুঝি?

— না, ঐ যে নীলপাড় শাড়ি পরা ফচকে মেয়েটা সবার সামনে বসে আছে, কালও তো ওকে দেখেছিলুম। আমার কাজ দেবার হলে আমি ওকেই প্রথমে কোনো কাজ দিতুম।

— তাই দে না। কোনো একটা কাজের ছুতো বানিয়ে নে।

— মন্দ বলিস নি, এদের কয়েকজনকে দিয়ে ডাকবাংলোয় আর একটা ঘর তুলে নিলে হয়।

— ডাকবাংলোয় কেন? জঙ্গলের মধ্যে যে-ভাঙা বাড়িগুলো দেখলুম, সেগুলো নিশ্চয়ই বেওয়ারিস, সেগুলোই ওদের দিয়ে সারিয়ে আমরা নিয়ে নিলে পারি!

মেয়েগুলো হাসি ও কথা থামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। ওরা ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানলো। সাঁওতাল মেয়েদের বয়েস ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস সবার নিশ্চিত। নীলপাড় শাড়ি পরা মেয়েটির বয়েসই কম সবচেয়ে। অন্য মেয়েরা চোখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু সে এই নতুন চারটে বাবুর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। কালো পাথরের মতন আঁট স্বাস্থ্য মেয়েটার, সাদা শাড়িটা কিন্তু বিস্ময়কর রকমের ফরসা। ওদের কারুরই শাড়ি ময়লা নয়, জঙ্গলে থাকে, কুলির কাজ করতে এসেছে, কিন্তু ধুলোবালি মেখে আসে নি। এমন কি ওদের মুখ ও শরীরের চকচকে চামড়া দেখলে মনে হয়—ওদের শরীরেও এক বিন্দু ময়লা নেই।

যারা ভদ্দরলোক, যারা বাবু, তারা প্রকাশ্যে অন্তত সাঁওতাল মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে না—এইটাই অলিখিত নিয়ম। এইসব অঞ্চলের হাটে-বাজারে, রাস্তায় অনবরত সাঁওতাল মেয়েরা ঘোরে তাদের ব্লাউজহীন বুক ও ছেঁড়া শাড়ি নিয়ে—কিন্তু কেউ তাদের দিকে চেয়ে দেখবে না। কেউ বলবে না, বাঃ, ঐ মেয়েটির স্বাস্থ্য কি সুন্দর! কিন্তু এই চারজন—এরা নতুন বাবু, এরা কলকাতার লোক, এরা বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলোকে দেখছে। রবি এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে নীলপাড় মেয়েটির দিকে।

শেখর বললো, হঠাৎ যেন এদের দেখলে আগেকার সেই ক্রীতদাস-দাসীদের বাজারের কথা মনে পড়ে। ওরা যেন নিজেদের বিক্রি করার জন্য বসে আছে, যদি কেউ কখনো কেনে।

রবি বললো, চল না, আমরা প্রত্যেকে এক-একজনকে কিনে নিয়ে যাই।

— উহুঁ এসব বাজে মতলব করিস নি, ঝঞ্ঝাট হবে অনেক। এটা সত্যি আশ্চর্য লাগে, ওরা রোজ চাকরি পায় না, তবু ওরা হাসাহাসি করে কি করে? দিব্যি তো বসে হাসছিল এতক্ষণ।

সত্যিই ওরা চলে যাবার জন্য পেছন ফিরতেই সব মেয়েরা কি একটা কথায় একসঙ্গে হেসে উঠলো, হাসির ধমকে এ–ওর গায়ে ঢলে পড়লো, সেই নীলপাড় শাড়ি পরা ফচকে মেয়েটা হাতের ঝুড়ি উলটো করে মাথায় বসিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগলো। রবি অনেকবার পেছন ফিরে নিজের ঠোঁটে সেই হাসির জবাব দিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, আশ্চর্য!

শেখর আবার বললো, সত্যি কুলি–মজুরের কাজ করুক আর যাই করুক, হাসিটা ওদের রানীর মতন।

সঞ্জয় বললো, রানীর মতন? তুই ক'টা রানীকে হাসতে দেখেছিস রে? স্বচক্ষে একটাও রানী দেখেছিস?

সিনেমায় অনেক দেখেছি!

ফেরার পথে মাঠের সর্ট–কাট দিয়ে না এসে ওরা পাকা রাস্তাই ধরেছিল, দেখা গেল, দূর থেকে রতিলাল ছুটতে ছুটতে ওদের দিকেই আসছে। কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, রেঞ্জারবাবু আসিয়েছেন, আপলোককে বোলাতে বুললেন।

রবি ভুরু কুঁচকে বললো, কেন, রেঞ্জারবাবু আমাদের ডাকবেন কেন?

— সাহেব তো বাতাতা, আপলোকো কোনোই রিজার্ভ নেহি থা।

— জরুর হ্যায়!

— ঠিক হ্যায়, উনসে বাতচিত তো কর লিজিয়ে। সাহাব বোলা তুরন্ত সাহেবলোগকো বোলাও, ঐসি লিয়ে হম—

রবি ধমকে উঠে বললো, রেঞ্জার তোমাদের কী এমন সাহেব যে, ডাকলেই যেতে হবে? সাহেবকে গিয়ে বলো, আমাদের যখন সময় হবে তখন যাবো। এখন আমাদের সময় হবে না।

রতিলাল তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে রবি ফের ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও! তোমার সাহেবকে গিয়ে বলো, আমরা এক ঘণ্টা বাদে ফিরবো—সাহেব যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন।

বন্ধুদের দিকে ফিরে নিম্নস্বরে রবি বললো, ডাকামাত্র গেলে প্রেস্টিজ থাকে না। আমরা ওর হুকুমের চাকর বুঝি? চল, একটু দেরি করে যাবো, শহরের ঐ দিকটা বরং দেখে আসি।

ওরা উলটো দিকে ফিরে শহরের অন্যদিকে রওনা হলো। এদিকেও বিশেষ কিছু নেই, তবু চোখে পড়লো একটা অসমাপ্ত স্কুল, ইঁটখোলা, শিবমন্দির, কয়েক ঘর মধ্যবিত্তর বাড়ি। কিছুদূর যেতে না যেতেই ফাঁকা মাঠ শুরু হলো। দু'একটা সরষে–ক্ষেতে একরাশি ফুল ধরেছে, হলুদ–রঙা ঢেউ উঠছে হাওয়ায়। মাঠের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের পাথর, পাথরটার মাথার ওপর ঠিক ছাতার মতন একটা পাকুড়গাছ। ওদের তো এদিকে সত্যি কোনো দরকার নেই, শুধু খানিকটা সময় কাটানো, তাই ঐ পাথরটার ওপর কিছুক্ষণ বসে আবার চলে যাবে এই ভেবে পাথরটার দিকে এগুলো।

সকাল ন'টাও বাজে নি, তবুও এর মধ্যেই রোদ চড়া হয়ে এসেছে। এদিকে জঙ্গল নেই, বহুদূর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো মাঠ। সেই মাঠ জুড়ে ঝকঝক করছে রোদ্দুর। এক ঝাঁক হরিয়াল উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে, দূরে শোনা গেল ট্রেনের শব্দ।

এরকম জায়গায় এলেই হঠাৎ মনে হয় যে, পৃথিবীটা মোটেই গোল নয়, চৌকো। *পৃথিবী* কখনো ঘোরে না, স্থির হয়ে থাকে। সময়ের কোনো গতি নেই। রবি সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে দিয়ে বললো, মাত্র কাল সকালে এসেছি—অথচ এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন অনেক কাল ধরে

এখানে আছি।

মাঠের মাঝখানে এই জায়গাটা টিবির মত উঁচু হয়ে উঠেছে, বেশ পরিষ্কার। খুব ভালো পিকনিকের জায়গা হয়, না রে?—রবি বললো।—তা কলকাতার কাছাকাছি এই রকম জায়গা হলে পিকনিকের পক্ষে ভালো হতো, কিন্তু আমরা আছি জঙ্গলের মধ্যে, সুতরাং বনভোজন বলতে যা বোঝায়—

কথা বলতে বলতে ওরা থেমে গেল। পাথরটার পাশ থেকে ছোটছেলের খিল খিল হাসি ও মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছিল। ওরা টিবিটার ওপর উঠে এসে পাথরটার এ-পাশে তাকালো। দু'টি মহিলা, একটি তিন চার বছরের বাচ্চা ছেলে ও একজন বুড়ো দরওয়ান।

মহিলা দু'টি চমকে ওদের দিকে তাকালো, ওরাও এক পলক চেয়ে দেখে ভাবছিল, চলে যাবে কিনা, এমন সময় শেখর পরম স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠলো, ঠিকই মনে হয়েছিল কাল, চেনা-চেনা—তুমি জয়া নও? প্রেসিডেন্সি কলেজের—

দু'জনের মধ্যে যে-মেয়েটির স্বাস্থ্য ঈষৎ ভারী, প্রতিমার মতন মুখের গড়ন—তার মুখে ক্ষণিক আশঙ্কা ও প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছিল, তারপরই খুশিতে ঝলসে উঠলো, বললো, আরেঃ, তাই তো, শেখরবাবু; আমিও প্রথমটায় ভেবেছিলুম—কাল সকালে আপনারাই এসেছেন, না? বম্বে মেলে—

— তুমি কি করে জানলে?

— বাঃ, কাল আমাদের গেটের পাশ দিয়ে আপনাদের যেতে দেখলুম, এখানে তো কেউ বড় একটা আসে না।

— তোমরা ঐ ত্রিপাঠীদের বাড়িতে থাকো বুঝি? কাল তো তোমরা ব্যাডমিন্টন খেলছিলে, আমাদের দেখলে কখন?

— মেয়েরা খেলার সময়েও সব দিকে চোখ রাখে। এখানে হঠাৎ এলেন যে?

— তোমরা এখানে কেন?

— বাঃ, এখানে তো আমার শ্বশুরবাড়ি!

—ও, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?

— কবে—ছ'বছর আগে। এই যে আমার ছেলে, আর এ আমার বোন, অপর্ণা।

চেহারা দেখলে দু'বোন বলে চেনাই যায় না, অপর্ণা ছিপছিপে, একটু বেশি লম্বা, কমলা রঙের শাড়িটা এমন আঁট করে পরা যে একটু দূর থেকে দেখলে শালোয়ার-কামিজ বলে ভুল হয়। সে গাছের গুঁড়িতে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতে একটা বড় লাল-সাদা বল, এবার বলটা ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে বললো, নমস্কার। আপনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

অপর্ণা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে, যার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকাতে হয়। প্রথমেই এক দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না। ওর বয়েস কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, কিন্তু ওর মুখে-চোখে একটা বিরল সপ্রতিভ সরলতা আছে। প্রথম পরিচয়ের কোনোরকম লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই। সাবলীলভাবে ও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুললো, কথা বললো ঝর্নার জলের মতন স্বচ্ছ গলায়।

শেখর উত্তর দিলো, হ্যাঁ, বেড়াতেই। আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—এর নাম রবি চৌধুরী, ভালো স্পোর্টসম্যান যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। ওর নাম অসীম মল্লিক, ওদের নিজেদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম আছে, আর ও হচ্ছে সঞ্জয় ব্যানার্জি—জয়া, তুমি ওকে দেখেছো বোধহয়, প্রেসিডেন্সিতে আমাদের চেয়ে এক ইয়ার জুনিয়র ছিল, এখন পাটকলে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে—লেবাররা অবশ্য ওর কাছ থেকে ওয়েলফেয়ার

চায় না।

জয়া বললো, রুণি, আর ইনি হচ্ছেন শেখর সরকার, আমরা একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে হিস্ট্রি অনার্স পড়তুম। উঃ, কতদিন পর দেখা—সাত আট বছর, না? সেই পারমিতার বিয়ের সময়।

শেখর বললো, আমিও কাল তোমায় এক ঝলক দেখে চিনতে পেরেছিলুম, তারপর ত্রিপাঠীদের বাড়ি শুনে কিরকম গুলিয়ে গেল। আমার বন্ধুদের বললুম। ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না, তোমার মতন কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে।

জয়া এ কথায় কিছু বললো না, শুধু মুখ টিপে হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিশ্চয়ই এখনো বিয়ে হয় নি?

— না! কেন?

— আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

শেখর একটু বিব্রত হয়ে বললো, ভ্যাট! কিন্তু তোমার এই ধ্যাধ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে বিয়ে হলো কি করে?

— আমার মোটেই এখানে বিয়ে হয় নি। আমার বিয়ে হয়েছে বর্ধমানে আমার শ্বশুরের এখানে একটা বাড়ি আছে—এখানকার জলে ওঁর খুব উপকার হয় বলে মাঝে মাঝে আসেন—আমিও সঙ্গে আসি।

অপর্ণা বললো, আপনারাই বা হঠাৎ এখানে বেড়াতে এলেন কেন?

অন্য কেউ কিছু উত্তর দেবার আগেই রবি বললো, ঐ যে—এখানকার জল খুব ভালো, সেই শুনেই এলাম।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। অপর্ণা ঠোঁট উলটে বললো, জল খেতে আবার কেউ আসে নাকি? আমি তো পাঁচদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। এমন বিশ্রী জায়গা—মেজদি'রা যে কি করে থাকে—একটা কিছু দেখবার নেই—

শেখর বললো, কেন, জঙ্গলটা তো বেশ সুন্দর।

— আমার জঙ্গল ভালো লাগে না।

শেখর বললো, আমরা ইচ্ছে করেই এরকম একটা নাম-না-জানা জায়গায় এসেছি, জঙ্গলের মধ্যে নিরিবিলি কাটাবো বলে—কিন্তু তোমরাও যে কেন এই সময়ে এলে! এখন সন্দেহ হচ্ছে।

— কেন, আমরা এসে কি অসুবিধে করলুম?

— তোমাদের দেখার পর আমার বন্ধুরা কি আর জঙ্গলের নিরিবিলিতে থাকতে চাইবে?

জয়া হাসতে হাসতে বললো, তাহলে তো আমরা এসে খুব ভালোই করেছি।

— কেন?

— চার চারটে এমন ভালো ভালো ছেলে জঙ্গলে এসে সন্ন্যাসী হতো—আমরা সেটা বন্ধ করতে পারবো।

হাসি শেষ করে শেখর বললো, তোমার ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে, জয়া। নাম কী ওর?

— দেবকুমার।—তোমার নাম বলো, কাকুদের কাছে তোমার নাম বলো ছোটন!

— জয়া, তোমার স্বামী এখানে আছেন? আলাপ করতে হবে।

— না।

— উনি তোমাদের সঙ্গে আসেন নি বুঝি?

জয়া এ কথার উত্তর তক্ষুনি না দিয়ে বোনের দিকে তাকালো। অপর্ণা দ্রুত ওদের চারজনের মুখের প্রতীক্ষা দেখে নিয়ে—হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে মাটি থেকে বলটা তুলে নিলো। তারপর জয়ার ছেলের হাত ধরে বললো, চলো ছোটন, এবার বাড়ি যাই আমরা। এ কি, বলটা ফেলে দিলে?

চলো, বাড়ি যাবো—দাদু একা বসে আছেন!

জয়া অপেক্ষারত বুড়ো দারোয়ানকে বললো, পরমেশ্বর খোকাবাবুকে নিয়ে তুমি এগিয়ে চলো, বাড়ি যেতে হবে। ঐ বলটা কুড়িয়ে নাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লক্ষ্মী ছোটন, আর হাঁটে না এখন, দরওয়ানজীর কোলে উঠে পড়ো, লক্ষ্মীসোনা, বিকেলবেলা আবার বেড়াতে বেরুবো, তখন তুমি আবার নিজে নিজে হাঁটবে।—রুণি, ওর জুতোটা পরিয়ে দে তো—

দরওয়ান ছেলেকে কোলে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে জয়া মাটির দিকে চোখ নিচু করলো, গলার স্বরে খুব দুঃখ ফুটলো না, কিছুটা উদাসীনভাবে বললো, আমার স্বামী বেঁচে নেই।

— সে কি?

— বিলেতে একটা ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল, তারপর সেখানে নিজের ঘরে কেউ এসে ওকে খুন করে যায়...কাগজে বেরিয়েছিল...।

একটুক্ষণ ওরা সবাই চুপ করে রইলো। জয়ার ভরাট স্বাস্থ্য, সারা পিঠজোড়া কালো কোঁকড়ানো চুল, নানান রঙে রঙিন একটা ছাপার শাড়ি পরেছে—সেই জন্যই বোধহয় খবরটা বেশি আঘাত দিলো।

অসীম বললো, হ্যাঁ, বছর দু'এক আগে—কাগজে আমিও দেখেছিলাম মনে আছে, ইঞ্জিনিয়ার কেন খুন হয়েছিল, কারণ জানা যায় নি। আপনারা কিছু আনতে পারেন নি?

জয়া ও অপর্ণা একবার চোখাচোখি করলো, তারপর জয়া অনেকটা স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললো, না। ওখানকার পুলিশ শেষ-পর্যন্ত জানিয়েছে—খুন নয়, আত্মহত্যা।

শেখর আঁৎকে উঠে বললো, আত্মহত্যা! মানুষ এখনো আত্মহত্যা করে নাকি? আত্মহত্যা কেন করেছিলেন?

জয়া ও অপর্ণা চকিতে আরেকবার চোখাচোখি করলো। এবার যে একটা ছোট্ট বিষণ্ন নিঃশ্বাস উড়ে গেল, সেই সঙ্গেই ভেসে এলো জয়ার উত্তর, না, সেরকম কোনো কারণ কেউ জানতে পারে নি।

যে জন্যই হোক, রবির কাছে যেন মনে হলো, খুনের চেয়ে আত্মহত্যাটা অপমানজনক। কেননা, সে বেশ রাগত সুরেই বলে উঠলো, আত্মহত্যা মোটেই নয়, ওরকম একজন লোক শুধু শুধু আত্মহত্যা করতেই বা যাবেন কেন! তাও বিলেতে বসে? ওখানকার পুলিশ কালপ্রিটকে ধরতে পারে নি, তাই আত্মহত্যা বলে চালিয়েছে। আজকাল ওখানকার পুলিশও হয়েছে আমাদেরই মতন, একেবারে যা-তা, এই তো সেদিন অতবড় একটা মেল ট্রেন ডাকাতি হয়ে গেল ইংলন্ডে, পুলিশ তো একজনকেও—।

অপর্ণাকে দেখা গেল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সে বিষয় পরিবর্তনের এই সুযোগ বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কোন ট্রেন ডাকাতি?—এবং সে রবির কাছ থেকে ট্রেন ডাকাতির পুরো গল্পটা শুনতে চেয়ে ওদের মাঝখানে সরে এলো।

টিলা থেকে জয়াদের বাড়ি প্রায় পনেরো মিনিটের পথ, সেই পথটুকু আসতে আসতে গল্প ঘুরে গেল অন্যদিকে; যখন গেট পর্যন্ত পৌঁছলো তখন জয়ার মুখেও আবার ক্ষীণ হাসি ফুটেছে, অপর্ণা সহজে হাসতে চায় না—ঠোঁট অল্প ফাঁক করে বুঝিয়ে দেয় যে, আরেকটু ভালোভাবে বলতে পারলে ঠিক হাসতুম! রবি তবু তাকে হাসাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং না হাসলেও অপর্ণার হাঁটার ছন্দে লঘুতা এসেছিল। পরমেশ্বর আগেই পৌঁছে দেবকুমারের হাত ধরে গেট খুলে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া বললো, আসুন, ভেতরে এসে বসবেন একটু। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে যান। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আপনাদের ভালোই লাগবে। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো করেছেন।

রবি ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, শেখর বললো, না, এখন থাক। পরে আসবো রবি, রেঞ্জারের সঙ্গে একবার তো দেখা করতেই হবে।

রেঞ্জারের কথা রবি ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছিল, এখন মনে পড়তেই বললো, হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা দরকার।

অপর্ণা বললো, তা হলে কাল সকালে আপনারা আসুন–না, আজ বিকেলে হবে না। বিকেলে আমাদের একটু ঘাটশীলায় যাবার কথা আছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে চলে আসুন, এখানেই আমাদের সঙ্গে চা খাবেন!

ওরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ চমৎকার! আপনাদের বাড়িতে ডিম আছে তো?

— তা আছে, কিন্তু হঠাৎ শুধু ডিম কেন?

সঞ্জয় বললো, সকালে চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ না পেয়ে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। এখানে একদম ডিম পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়া হাসতে হাসতে বললো, যাচ্ছে না বুঝি? ঐ জঙ্গলের মধ্যে ডাকবাংলোয় কেউ এক রাত্তিরের বেশি থাকে? খাবার–দাবার এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না প্রায়। আমাদের বাড়িতে এসে থাকুন না—এখানে অনেক ঘর আছে।

শেখর বললো, না না, আমরা জঙ্গলেই থাকবো ভেবে এখানে এসেছি। যদি অবশ্য খুব বিপদে পড়ি; তা হলে এখানে চলে আসতে পারি।

— বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে বুঝি?

— বলা যায় না। ডাকবাংলোয় রিজার্ভেসান নিয়ে একটু ঝামেলা করছে। দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, কাল সকালে আসবো।

— ঘুম থেকে উঠেই চলে আসবেন। আমাদের কিন্তু খুব সকাল সকাল চা–খাওয়ার অভ্যেস!

ডাকবাংলোর সামনে জিপ দাঁড় করানো। বারান্দায় ইজিচেয়ারে রেঞ্জার বসে বসে পা দোলাচ্ছে খাকি প্যান্ট ও সাদা–শার্ট পরা শক্ত সমর্থ পুরুষ, হাতে পাইপ। লোকটির মুখখানা কঠিন ধরনের কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করা, লোকটি একা একাই বসে আপন মনে হাসছে অথবা গান করছে।

রবি সিগারেট অর্ধেক অবস্থাতেই ফেলে দিলো, পকেট থেকে চুরুট বার করে ধরালো। ওর ধারণা চুরুট মুখে থাকলে ওকে খুব ভারিক্কী দেখায়। গলার আওয়াজও তখন ইচ্ছে করে গম্ভীর করে ফেলে। একাই আগে গিয়ে বললো, নমস্কার! লোকটি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর হাত জোর করে দু'বার বললো, নমস্কার নমস্কার। আপনারাই বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন? কী সৌভাগ্য আমাদের, এসব জংলা জায়গায় তো কেউ আসে না—লোকে যায় ঘাটশীলা, তবু আপনারা এলেন—বসুন, বসুন।

রবি প্রশ্নবোধক ঝোঁক দিয়ে বললো, আপনি?

লোকটি বললো, আমি এ অঞ্চলের ফরেস্ট রেঞ্জার আমার নাম সুখেন্দু পুরকায়স্থ, বেহারেই ছেলেবেলা থেকে...এ অঞ্চলে ট্যুরে এসেছিলাম হঠাৎ ফরেস্টার বললে, কে চারজন আন অথরাইজড্ লোক বাংলোয় এসেছে। তা আমি বললুম, আরে মশাই যান না, গিয়ে দেখুন তারা

কে, বাঘ-ভাল্লুক তো নয়। তা জঙ্গলের চাকরিতে বাঘ-ভাল্লুকেও ভয় করলে চলে না—তা ওরা নিশ্চয়ই ভদ্দরলোক...ফরেস্টার এমন ভীতু, নিচে আসতে চায় না।

রবি বললো, আন-অথরাইজড হবার কি আছে? খালি বাংলো দেখে এসেছি, যা চার্জ লাগে দেবো। এর মধ্যে আবার গণ্ডগোলের কি আছে?

লোকটি অত্যন্ত বিনীতভাবে হেসে বললো, তা তো বটেই, তা তো বটেই, ঠিক কথা বলেছেন। ফরেস্ট বাংলো খালি থাকলেও সব সময় লোককে দেবার নিয়ম নেই অবশ্য, তাছাড়া এই ইয়ে, মানে, রেলওয়ে রিসিটকে রিজার্ভেসান স্লিপ বলে চালানোরও কোনো সিস্টেম নেই এদিকে, তবে, মানে, আপনারা এসেছেন—

রবি এই প্রথম হাসলো। দেখে মনে হয়, অতিকষ্টে হাসতে রাজি হলো। চুরুট আবার জ্বালতে জ্বালতে বললো, ওসব চৌকিদারের জন্য, সে তো খুলতেই চাইছিল না, তাই আর কি—আপনাদের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝিয়ে বলতুম। ফরেস্টারই বা আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি কেন?

—দরজার চাবি খোলার দায়িত্ব চৌকিদারের। এই সামান্য অপরাধেই তার চাকরি যেতে পারে। দেখবেন ওর চাকরিটা যেন না যায়, গরিব লোক, তাছাড়া শুনলুম বৌয়ের অসুখ। আমি অবশ্য চাকরি দেবার বা খাবার লোক নই।

— আপনি এবার কাজের কথাটা বলুন তো? আপনার বক্তব্যটা কি? বুঝতেই পারছেন, আমরা এসেছি যখন—তখন চলে তো আর যাবো না! রিজার্ভেসান থাক আর নাই থাক—আমরা এখানে থাকবোই। তার জন্য কি করতে হবে আমাদের? আপনি কিছু আলাদা টাকা চাই বার জন্য এত ভূমিকা করছেন? কত টাকা বলুন, বিবেচনা করে দেখবো।

লোকটি হঠাৎ স্থিরভাবে রবির চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অদ্ভুতভাবে একরকমের হাসলেন। গলার স্বর বদলে অসহায়ভাবে বললেন, আমাদের এ লাইনে উপরি রোজগার যে একেবারে নেই, সে কথা বলতে পারি না, আছে বটে, কন্ট্রাক্টররা যখন চুক্তির বেশি গাছ কাটে তখন পাই। কিন্তু ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে ঘুস নেবার অভ্যেস আমাদের নেই। এর আগে কেউ দিতেও চায় নি। আপনারা ক'দিন থাকবেন?

— কোনো ঠিক নেই। সাতদিন, দশদিন, কিছুই ঠিক করি নি।

— এই জঙ্গলে সাতদিন দশদিন থাকবেন?

— কোনো ঠিক নেই। যে-ক'দিন আমাদের ভালো লাগবে সেই ক'দিন থাকবো।

— তাহলে তো কিছুই বলার নেই। আপনাদের তো আমি চলে যেতে বলতে পারি না। আর আমি বললেই বা আপনারা যাবেন কেন! ডিভিশনাল কনজারভেটরের এদিকে আসবার কথা আছে, তিনি সঙ্গে বৌ নিয়ে চলাফেরা করেন সব সময়, তাঁর আবার শ্বশুরবাড়ির এদিকেই—।

রবি রুক্ষ গলায় বললো, ঠিক আছে, কনজারভেটর এলে তাঁর সঙ্গেই কথা বলবো, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলে লাভ নেই।

শেখর এবার এগিয়ে এসে বললো, বাংলো খালি আছে বলেই আমরা আছি। কনজারভেটর বা অন্য কেউ এলে আমরা তখুনি ছেড়ে চলে যাবো। আমাদের থাকবার জায়গার অভাব নেই।

নতুন লোকের সঙ্গে কথা শুরু করার জন্যই বোধহয় রেঞ্জার আবার আগেকার বিনীত ভাব ফিরিয়ে আনলেন, না না, আপনাদের চলে যেতে হবে তা তো বলি নি। কনজারভেটর আসতেও পারেন, না আসতেও পারেন। আসবার কথা আছে, কিন্তু কথা থাকলেও ওঁরা সব সময় আসেন না। ওঁরা হলেন বড় অফিসার সব সময় কথার ঠিক রাখা তো ওঁদের মানায় না। তবে যদি আসেন, তবে ডি. এফ. ও. সাহেবও আসবেন বোধহয়, সাধারণত তাই আসেন। রাত্তিরে থাকলে—

দু'খানা ঘরই ওঁদের লাগে।

—ঠিক আছে, তিনি যে মুহূর্তে আসবেন, সেই মুহূর্তেই আমরা ঘর ছেড়ে দেবো।

রবি শেখরকে সরিয়ে দিয়ে বললো, কেন, ছাড়বো কেন? এটা কি কনজারভেটরের শ্বশুরবাড়ি নাকি? উনি যখন খুশি আসবেন, তখনি ওনাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে?

শেখর রবির দিকে একটা হাত তুলে বললো, আঃ, রবি, মাথা গরম করিস নি। ওদের যদি সে রকম কোনো আইন থাকে, আমরা বাংলো ছেড়ে দিয়ে জয়াদের বাড়ি চলে যাবো!

রবি বললো, না, আমি জয়াদের বাড়ি যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। এই লোকটা কি হিসেবে বলছে আমাদের ঘর ছাড়তে হবে?

রেঞ্জার তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তাই কি আমি বলেছি! ঘর আপনাদের ছাড়তেই হবে—এমন কোনো কথা নেই। আমি বলেছি যদি কনজারভেটর সাহেব আসেন এবং যদি থাকতে চান তাছাড়া, সেদিন সাহেবের মেজাজ কী রকম থাকে, তার ওপর নির্ভর করছে। মেজাজ ভালো থাকলে তিনি আমায় ডাকেন সুখেন্দু বলে, আর গরম থাকলেই বলবেন পুরকাইট! তেমনি মেজাজ ভালো থাকলে তিনি হয়তো আপনাদের অনেক খাতির করবেন, আপনাদেরই এখানে থাকতে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবেন অন্য বাংলোয়! আবার খারাপ থাকলে প্রথমেই চৌকিদারের চাকরি যাবে, তারপর বুঝলেন না, অত বড় বড় সাহেবদের তো মেজাজ একরকম থাকলে মানায় না!

শেখর হাসতে হাসতে বললো, ভারি তো একজন সরকারী অফিসার, তার মেজাজে আমাদের কি আসে যায়? তার মেজাজ ভালো–খারাপ থাকার ওপরেই আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে নাকি? রেঞ্জারও স্মিত হেসে বললো, না স্যার আপনাদের ভাগ্য কেন নির্ভর করবে! অন্যদের ভাগ্য...! বড় অফিসারদের তো মেজাজ না থাকলে মানায় না!

রবি বললো, কী মুশকিল এত কথার দরকার কি! ডাকবাংলোয় থাকা কি একটা বিরাট ব্যাপার নাকি? আফটার অল, পাবলিক প্রপার্টি, খালি রয়েছে তাই আছি। তার আবার এত ঝামেলা।

লোকটি হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা আমি চলি। নমস্কার।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, উইস ইউ ভেরি গুড টাইম। ভাববেন না, আমি আপনাদের চলে যাবার কথা বলতে এসেছিলাম। আপনারা থাকলে আমার কোনো স্বার্থও নেই, ক্ষতিও নেই। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম, দেখবেন চৌকিদারটার চাকরি না যায়। কনজারভেটর এলে সেই দিকটা একটু দেখবেন।

— শুধু শুধু ওর চাকরি যাবে কেন?

সুখেন্দু পুরকায়স্থ এবার মলিনভাবে হাসলেন। বিষণ্ণভাবে বললেন, এক ডাকে সাড়া দিতে পারে নি বলে আমি অন্তত চারজন চৌকিদারের চাকরি যেতে দেখেছি। এ লোকটার তো আবার বউয়ের অসুখ!

তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে জিপে গিয়ে উঠলেন। আবার একবার হেসে গাড়ি ঘোরালেন। চলে যাবার পর শেখর বললো, লোকটা ভালো কি খারাপ ঠিক বোঝাই গেল না। আজকাল বেশিরভাগ লোককেই বোঝা যায় না।

রবি বললো, লোকটা দু'চারটে টাকা বাগাবার তালে ছিল নিশ্চয়ই। শেষ পর্যন্ত সাহস পেলো না।

— আমার তা মনে হয় না।

— যাকগে, এ পর্যন্ত তো চুকলো। এরপর কনজারভেটর এলে দেখা যাবে। রতিলাল, এ রতিলাল, চা বানাও—

পরক্ষণেই রবি প্রসঙ্গ বদলে বলে, তোর ঐ জয়া মেয়েটা কিন্তু বেশ! খুব স্যাড—এর মধ্যেই স্বামী মারা গেছে—তোর সঙ্গে ওর কিছু ছিলটিল নাকি?

শেখর অন্যমনস্কভাবে বলে, না, সেরকম কিছু না। দেখলি না, ওর বিয়ে হয়ে গেছে—সে খবরই জানতাম না!

৪

একটা বিচিত্র রঙিন পাখির পালক উড়তে উড়তে এসে পড়লো অতসী ফুলগাছগুলোর ওপরে। সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে পালকটা কুড়িয়ে নিলো। কোন পাখির পালক সেটা দেখার জন্য চাইলো এদিক–ওদিক। পাখিটাকে দেখা গেল না। অন্যমনস্কভাবে সঞ্জয় এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

ডাকবাংলোর সীমানার ঠিক প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যেই একটা সিমেণ্টের বেঞ্চ বাঁধানো রয়েছে, সঞ্জয় একা গিয়ে বসলো সেটার ওপর। রঙিন পালকটা নিজের মুখে বুলোতে লাগলো। পালকটা যেন ফুল, নাকের কাছে সেটা এনে সঞ্জয় গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলো। কোনো পাখির গন্ধও সেটাতে লেগে নেই।

সিমেণ্টের বেঞ্চটার এক পাশে কয়েকটা বনতুলসীর আগাছা হয়ে আছে। দুটো ফড়িং একসঙ্গে একটা ফুলের ওপর বসার চেষ্টা করছে। ঐটুকু ছোট একটা ফুলের ওপর দু'জনের বসার জায়গা নেই, ওরা দু'জনে মারামারি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে—আবার এসে বসছে সেই একই ফুলে। আরও তো ফুল রয়েছে, তবু ঐ একটা ফুলের ওপরই বসার জন্য দু'জনের লোভ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সঞ্জয় আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অপর্ণাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। মিঃ বিশ্বাসের মেয়ে অনুরাধার সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল! সেইরকম টিকোলো নাক, সেইরকম ভুরুর ভঙ্গি, বেশি উজ্জ্বল চোখ। অথচ অপর্ণা জয়ার বোন—সুতরাং মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকার কথাই নয়। তবু অপর্ণাকে দেখলেই অনুরাধার কথা মনে পড়ে। কিন্তু অনুরাধার চেয়েও তার বাবা মিঃ রথীন বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছিল সঞ্জয়ের। অথচ ওসব কথা আর মনে করবে না বলেই তো সঞ্জয় বেড়াতে এসেছে বন্ধুদের সঙ্গে।

শ্যামনগরের জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশ্বাস। শুধু ম্যানেজার নয়, তাঁর শ্বশুরের কোম্পানি—সুতরাং অর্ধেক মালিকও বলা যায়। লম্বা শরীর, বাহান্ন বছর বয়সেও অটুট স্বাস্থ্য, এখনো টেনিস খেলতে হাঁপান না। সঞ্জয় সামান্য লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার—তার সঙ্গে মিঃ বিশ্বাসের খুব বেশি অন্তরঙ্গতা থাকার কথা নয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কাকার সঙ্গে তিনি বিলেতে এক ফ্ল্যাটে ছিলেন ছাত্রজীবনে—সেই সূত্রে তিনি সঞ্জয়কে বাড়িতে ঘন ঘন ডেকে পাঠান। সঞ্জয়ের দিকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেন সঞ্জয়, আজ সন্ধেটা কি করা যায় বলো তো! এ উইকটা বড্ড খাটুনি গেছে—চলো, গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ঘুরে আসা যাক। গ্রেট ইস্টার্নে সাপার্ খেললে কেমন হয়? টেলিফোন করে দ্যাখো না—একটা টেবল্ পাওয়া যাবে কিনা! বাড়িতে বসে কোয়ায়েট ইভনিং কাটাবো, বুঝলে, ওটা আমার ধাতে সয় না!...বিলেতে থাকার সময় তোমার কাকার সঙ্গে এক একদিন সন্ধেবেলা...আমার গিন্নী আবার আশেপাশে আছেন কিনা দেখো—উনি এসব শুনলে আবার...আঃ, সে–সব গুড ওল্ড ডেইজ।

অনেক বড় বড় অফিসার বাড়ি ফিরেই পোষা কুকুরকে আদর করেন, কুকুর নিয়েই সারা সন্ধেটা কাটিয়ে দিতে পারেন। তেমনি, সঞ্জয় বুঝতে পারে, মিঃ বিশ্বাস বাড়ি ফিরে আরাম করে গা ছড়িয়ে বসার পর একজন শ্রোতা চান। সে শ্রোতা নিজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে হলে চলবে না,

চাকর-বাকর বা আত্মীয়স্বজন হলেও হবে না। একজন যুবক, শক্ত সমর্থ পুরুষ—তার কাছে মিঃ বিশ্বাস নিজের যৌবনের গল্প বলবেন। বোঝাতে চাইবেন, তাঁর নিজের যৌবনে তিনি এখানকার যে-কোনো যুবকের চেয়েও দুর্ধর্ষ ছিলেন, শোনাবেন নিজের নানান দুঃসাহসিক কীর্তি ও কৃতিত্ব। সেই যুবকের প্রতি তিনি প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুরে নানান হুকুম করবেন—তার সামনে দুরন্তবেগে গাড়ি চালিয়ে কিংবা দু'তিন ধাপ সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে তিনি প্রমাণ করতে চাইবেন—এখনো তিনি যে-কোনো যুবকের চেয়ে বেশি যুবক। সঞ্জয় এ ব্যাপারটা টের পেয়েছিল, বুঝেছিল এই জন্যই প্রতি সন্ধেবেলা জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশ্বাস তাকে ডেকে পাঠান। বুঝতে পেরেও সঞ্জয় বিশেষ কিছু আপত্তি করে নি। কারণ, মিঃ বিশ্বাস কথাবার্তা বেশ ভালোই বলতে পারেন। অনবরত নিজের সম্পর্কে গল্প করলেও রসিকতাবোধ আছে খানিকটা। জেনারেল ম্যানেজারের ডাক অগ্রাহ্যও করা যায় না।

তা ছাড়া অনুরাধার সঙ্গে দেখা হবার আকর্ষণও ছিল। অনুরাধার দিকে সঞ্জয় কোনো লোভের চোখে তাকায় নি। অনুরাধা বড় বেশি জ্বলন্ত—এইসব মেয়েকে হাত দিয়ে ছুঁতে ভয় করে। সব সময় চোখ দুটো চঞ্চল অনুরাধার—কথায় কথায় ঝর ঝর করে ইংরেজি বলে—আবার অর্গান বাজিয়ে গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাবার সঙ্গে সমানভাবে টেনিস খেলে এসেই আবার জানলা দিয়ে আলু-কাবলিওয়ালাকে ডাকাডাকি করে—বাড়ির কারুর বারণ না শুনে দারুণ ঝাল-মেশানো আলু-কাবলি খেতে খেতে জিভ দিয়ে উস্ উস্ শব্দ করে। সঞ্জয় অনুরাধার প্রতি মনে মনে লোভ রাখতেও সাহস পায় নি। শুধু এক দারুণ বাসনা ছিল অনুরাধাকে দেখার, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে একটা দুটো কথা বলার। মিঃ বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে অনুরাধাকে এক ঝলক দেখতে পেলেই তার মন খুশি হয়ে যেতো।

মিঃ বিশ্বাস একদিন বললেন, সঞ্জয়, আজ দুপুরে দেখলাম ঐ রতন বলে ছেলেটা তোমার সঙ্গে খুব হাত-পা নেড়ে গল্প করছে! ওসব ছেলেকে বেশি নাই দিও না—

সঞ্জয় বলেছিল, কেন, ও ছেলেটা তো বেশ ছেলে। ভালো কাজ জানে—

— না, না, কিস্যু কাজ করে না—শুধু দল পাকায়। ওসব দল-পাকানো ডার্টিনেস আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। যদি কিছু গ্রিভান্স থাকে—সোজা এসে আমাকে বলবে—তাছাড়া তুমি ওদের ইন্টারেস্ট দেখছো—

রতন ছেলেটিকে দেখে সঞ্জয় অবাক হয়েছিল। খুব সবল চেহারা, ফরসা গায়ের রং, কিন্তু সব সময় একটা ময়লা খাকি প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরে থাকে। বয়লারের দারুণ গরমে কাজ করতে করতে ওর মুখের রং খানিকটা জ্বলে গেছে। মুখখানা দেখে খুব চেনা-চেনা মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের, দু'একটা প্রশ্ন করতেই পরিচয় বেরিয়ে পড়েছিল।

মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে রতন বলেছিল, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, আমার নাম রতন আচায্যি, আপনাদের গাঁ মামুদপুরের পুরুত ঠাকুর যোগেন আচায্যিরই ছেলে আমি। কি করবো স্যার, পাকিস্তান হবার পর রিফুউজি হয়ে চলে এলাম—লেখাপড়া আর কিছু হলো না—বাবাও মন্তর-ফন্তরগুলো শেখাবার আগে মরে গেলেন! ঘণ্টা নেড়ে তবু ভণ্ডামির কারবার চালানো যেতো—তার থেকে এই বেশ আছি। গায়ে খেটে রোজগার করছি। ওসব সংস্কৃত-ফংস্কৃত বলতে গেলে আমার দাঁত ভেঙে যেতো!

পুরুত বংশের ছেলে, ওর বাপ-ঠাকুরদা চিরকাল ঠাকুর পুজো করে কাটিয়েছে—কিন্তু সে আজ মজুরের কাজ করছে—এবং সেজন্য কোনো গ্লানি নেই—এই ব্যাপারটা সঞ্জয়ের বেশ ভালো লেগেছিল। মাঝে মাঝে সে রতনের সঙ্গে তার দেশের গল্প, বাড়ির গল্প করতো।

জুট মিলে একদিন একটা ছোটখাটো দাঙ্গা হয়ে গেল দু'দল শ্রমিকের মধ্যে। সেদিন সন্ধের

পর মিঃ বিশ্বাস একটু বেশি নেশা করে ফেললেন। তীব্র কণ্ঠে তিনি বললেন, সঞ্জয়, আজকের কালপ্রিটদের একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলো—ওসব গুণ্ডা-বদমাশদের আমি আমার মিলে রাখবো না।

সঞ্জয় বললো, হ্যাঁ, পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে—

— ওসব পুলিশ-ফুলিশ না। আমাদের নিজেদের মিলের শ্রমিকদের আমরা চিনবো না? আমি সব রিপোর্ট পেয়েছি—ঐ যেগুলো দল পাকায়, ইউনিয়ন করে—সব ক'টাকে চিনি!

সঞ্জয় একটু অবাক হয়ে বললো, কিন্তু আজকের দাঙ্গাটার মধ্যে তো খানিকটা বাঙালি-বিহারী ফিলিং ছিল—ইউনিয়নের লোকরা থামাতে গিয়েছিল।

— মোটেই না, ওসব ওদের চালাকি! ঐ তোমার সেই রতন, তার এক চেলা আছে। কি যেন নাম, দাঁড়াও—আমার কাছে কাগজে লেখা আছে—এত চেষ্টা করছি এদের উন্নতি করার—আমি চাই শ্রমিকদের স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং উন্নত হবে, ওরা মানুষের মতন বাঁচবে, বেশি খাটবে—বেশি রোজগার করবে—তা নয়, কতগুলো সুইন্ডলার পলিটিসিয়ানের প্যাঁচে ভুলে ইউনিয়ন আর দল পাকানো—এতে দেশের কোনোদিন উন্নতি হবে তুমি বলতে চাও! শ্রমিকরা যতদিন বস্তিতে থাকবে—ততদিন দেশের উন্নতি নেই। ওদেরও ভালোভাবে বাঁচতে দিতে হবে—তার জন্য দরকার হলো কাজ, আরও কাজ—বুঝলে, কাজ না করে শুধু শুধু ইউনিয়ন আর ভোট—

আবেগে মিঃ বিশ্বাসের গলা কাঁপতে থাকে। সঞ্জয় সিগারেটে টান দিতে ভুলে যায়। অনুরাধা এই সময় ঘরে ঢুকলো। একটা অদ্ভুত ধরনের ব্লাউজ পরেছে অনুরাধা—কনুই পর্যন্ত হাতা—সেখানে ফ্রিল দিয়ে ফুলের মতন তৈরি করা, গলার কাছটাও ফুল-ফুল ধরনের, গত শতাব্দীর মেমসাহেবদের মতন মনে হয়—এবং সেই ব্লাউজে অপূর্ব দেখাচ্ছে অনুরাধাকে। সারাদিনের দুর্ভাবনা ও উত্তেজনা ভুলে গিয়ে সঞ্জয় তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। অনুরাধা মুক্তোর মতন দাঁত দেখিয়ে হাসলো, বললো, তোমরা দু'জনে এত সিরিয়াস ফেস করে বসে আছ কেন? সঞ্জয়দা, ক্যারম খেলবে?

সঞ্জয় কিছু উত্তর দেবার আগেই মিঃ বিশ্বাস বললেন, দাঁড়াও মা-মণি আমাদের কাজগুলো আগে সেরে ফেলি। এসো সঞ্জয়, আগে রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা যাক। বদমাশগুলোর সব ক'টাকে কাল ছাঁটাই করে দেবো।

অনুরাধা বললো, সঞ্জয়দা, আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যান-না। আমি আজ একটা পুডিং-এর এক্সপেরিমেণ্ট করেছি!

সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। অনুরাধা তার সঙ্গে নেহাত ভদ্রতাই করছে, তবু অনেকক্ষণ অনুরাধার সাহচর্য পাবার লোভে সঞ্জয় আর দ্বিরুক্তি করে না। মিঃ বিশ্বাস উঠে গিয়ে কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ এনে বললেন, এই নাও, এতে বদমাশগুলোর নাম আছে। এদের অপরাধের ডেফিনিট প্রুফ আছে আমাদের কাছে, তুমি এক্ষুনি নোটিশ তৈরি করে ফেলো। আমি চাইছি এদের উন্নতি করতে, আর এরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল বসাবে। এই এরিয়ার আর কোন মিল-ফ্যাক্টরিতে আমাদের মতন মজুরদের বাথরুমে ফ্রি সাবান সাপ্লাই করা হয়, খোঁজ নিয়ে দেখো তো!

একটু বেশি রাত্রে সঞ্জয় যখন নিজের কোয়ার্টারে ফিরছিল, তখন দেখতে পেলো রাস্তার মোড়ে একদল লোক জটলা করছে। একটু গা ছমছম করে উঠেছিল তার। দাঙ্গার উত্তেজনা রয়েছে, তাকে মজুররা হয়তো মালিক পক্ষের লোক বলে ভাবে, হঠাৎ আক্রমণ করে বসা বিচিত্র নয়। মিঃ বিশ্বাস তাঁর গাড়ি করে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সঞ্জয় আপত্তি করেছিল। পাঁচ সাত

মিনিটের পথ—এজন্য গাড়ি নেবার কোনো মানে হয় না।

দঙ্গল থেকে দু'জন লোক এগিয়ে এলো সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় চিনতে পারলো রতনকে। উত্তেজিত উগ্র মুখ। বললো, স্যার, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনকে যে-ভাবে বানচাল করে দেওয়া হচ্ছে—

সঞ্জয় রুক্ষভাবে বললো, এত রাত্রে সে-কথা আমাকে বলতে এসেছো কেন?

— এত রাত্রেই আসতে হলো, আপনাকে একটা ব্যাপারে সাক্ষী থাকতে হবে।

— সাক্ষী? আমি?

হ্যাঁ, স্যার—এই ভিখুরামকে এদিকে নিয়ে আয় তো!

সেই দঙ্গলের চারজন লোক একজন লোককে টানতে টানতে নিয়ে এলো। সে লোকটার প্রচণ্ড নেশা, পা টলছে, চোখ দুটো লাল—একজন তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বললো, বল, স্যারের কাছে বল কত টাকা পেয়েছিস!

সঞ্জয় বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, এসব কি ব্যাপার?

রতন বললো, আজকের দাঙ্গাটা কেন হলো, সেটা নিজের কানে আপনি শুনে রাখুন!

— আমার কাছে কেন? পুলিশের কাছে যাও!

— বাঃ, আপনি আমাদের অফিসার—আপনি জানবেন না?

সঞ্জয় মনে মনে একটু হাসলো। কারুর উপকার কিংবা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সে শুধু চাকরি করছে। শ্রমিকরা তাকে মাইনে দেয় না, মাইনে দেয় মালিক। মালিকের কথা মতন কাজ না করলে—তাকেই চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। তার জায়গায় অন্য লোক এসে—সে কাজ করবে।

রতন হঠাৎ সেই মাতালটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বললো, বল না শালা, বড় সাহেবের কাছ থেকে তুই কত টাকা পেয়েছিস।

সঞ্জয় রেগে উঠে ধমকে বললো রতনকে, রতন, তুমি ভদ্রবংশের ছেলে মিলে কাজ করতে এসেছো—সৎভাবে কাজ করবে সেটাই আশা করেছিলাম! তার বদলে এরকম গুণ্ডামি-বদমাইশী।

রতন রাগলো না, হেসে বললো, শুনুন স্যার, গুণ্ডামি-বদমাইশী কে করে! এই ভিখুরাম মদ খেয়ে সব স্বীকার করেছে—বড় সাহেবের পেয়ারের লোক ঘনু সরকার ভিখুকে আড়াইশো টাকা দিয়েছে মারামারি বাঁধাবার জন্য। শুধু ভিখু একা নয়, বাঙালিদের মধ্যেও দু'তিনজন পেয়েছে—দু'দলকে না উসকালে মারামারি হবে কেন? মারামারি কেন বাধিয়েছে জানেন—যাতে আমাদের ইউনিয়ানটা ভেঙে যায়—আমরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি জানাবো—সেটা যাতে না হয়—সেই জন্যই দলাদলি মারামারি লাগিয়ে—আপনি তো জানেনই স্যার, পর পর দু'বছর পাটের ওভার-প্রোডাকশন হয়েছে—রেট নেমে যাচ্ছে—সেই জন্য কোম্পানি চায় কাজ কমাতে, লোক ছাঁটাই করতে—কিন্তু আমাদের শ্রমিক-মজদুর ঐক্য কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না—আমরা জান দিয়ে ইউনিয়ানটাকে বাঁচাবো। মজদুরের আবার বাঙালি বিহারী কি! মজদুরের কোনো জাত নেই—

সঞ্জয় বেশ হকচকিয়ে রতনের বক্তৃতা শোনে। পুরুতের ছেলে রতন সংস্কৃত উচ্চারণ করতে ভয় পেলেও বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বেশ জোরালোভাবে এসব বলতে শিখেছে। হঠাৎ সঞ্জয়ের মনে পড়লো, কাল সকালেই মিলের গেটে নোটিশ ঝুলবে। ছাঁটাইয়ের নোটিশ—যে দশজন ছাঁটাই হবে, তার মধ্যে রতনেরও নাম আছে। রতন বলছে, ওর ইউনিয়ানটাকে জান দিয়ে বাঁচাবে—কিন্তু কাল থেকে মিলের মধ্যে ওর ঢোকাই বন্ধ। হঠাৎ সঞ্জয়ের একটা দারুণ ঘৃণা জন্মালো। সেই ঘৃণা মিঃ বিশ্বাসের ওপর, অনুরাধার ওপর, নিজের ওপর, এমনকি ঐ ভিখুরাম

আর রতনের ওপরেও। সঞ্জয়ের মনে হলো, চারদিকে থু-থু করে ছেটায়। চতুর্দিকেই নোংরা।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাগ এবং ঘৃণা এসে জমা হয়েছিল নিজের ওপরেই। মিঃ বিশ্বাসের খুব বেশি দোষ সে দেখতে পায় নি। সঞ্জয় এত বোকা নয় যে, মিল পরিচালনার এইসব গতানুগতিক পদ্ধতি সে বুঝতে পারবে না! প্রতিবাদ না করুক, সে যা না-বোঝার ভান করেছিল সে শুধু অনুরাধার সাহচর্য পাবার জন্য। অথচ, সেই অনুরাধাকে পুরোপুরি পাবার চেষ্টা কিংবা লোভ রাখার মতন দুঃসাহসও তার নেই—সেইজন্যই বেশি রাগ নিজের ওপর।

সঞ্জয় তারপর এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে। শুধুই ভেবেছে দিনের পর দিন। নিজের জন্য সে কোনো পথ খুঁজে পায় নি। ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল—এসব ব্যাপার যদি সে ভুলে থাকতে না পারে—তবে তার কোনো উপায় নেই! হয়তো সে পাগল হয়ে যাবে—পৃথিবীতে অনেক কল-কারখানাতেই এরকম ছাঁটাই হয়, মারামারি হয়—সঞ্জয় তার কি করবে? সে বড়জোর চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। তারপর? সুতরাং ভুলে থাকাই একমাত্র উপায়।

অরণ্যে এসে এসব তো সে ভুলতেই চেয়েছিল। ভেবেছিল, সভ্য জগতের সবকিছু এই অরণ্যের বাইরে পড়ে থাকবে। সঞ্জয় অনেকখানি ভুলতেও পেরেছিল, হঠাৎ জয়ার বোন অপর্ণাকে দেখে মনে পড়লো অনুরাধার কথা। সঞ্জয়ের একটু মন খারাপ হয়ে গেল—চোখের সামনে ভেসে উঠলো অনুরাধার ছিপছিপে চঞ্চল শরীরটা। অথচ অনুরাধা তার কেউ না। অনুরাধার সঙ্গে সে একদিনও গাঢ় স্বরে কথা বলে নি। শুধু তাকে দেখতে পাওয়ার লোভেই সঞ্জয় তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে রাজি ছিল!

কয়েকটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে সঞ্জয় সেই বনতুলসী ফুলের ওপর বসা ফড়িং দুটোর দিকে ছুড়ে ছুড়ে মারতে লাগলো। একটাও লাগলো না। ফড়িং দুটোর মধ্যে এখন ভাব হয়ে গেছে—তারা দু'জনেই কোনোক্রমে সেই একটা ফুলের ওপর বসেছে। সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে ওদের ধরতে গেল। পারলো না, দুটোই উড়ে গেল একসঙ্গে। তখন সঞ্জয় সেই ফুলটাকে ছিঁড়ে আনলো, দেখতে চাইলো ফুলটার এমন কি বিশেষত্ব আছে!

অনেকক্ষণ থেকেই কার ডাক শোনা যাচ্ছিল। সঞ্জয় এবার উৎকর্ণ হলো। রবি আর অসীম মাঝে মাঝে তার নাম ধরেই ডাকছে। বেঞ্চটা থেকে উঠে সঞ্জয় ফিরে এলো ডাকবাংলোর দিকে। বারান্দায় অসীমকে দেখে বললো, কি রে, ডাকছিস কেন?

— বাঃ, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? রান্না চাপাতে হবে না?

— আমার রাঁধতে ভালো লাগছে না। কাল রেঁধেছি বলে আজও আমি রাঁধবো নাকি? তোরা বসে আড্ডা দিবি—আর আমি একা রান্নাঘরে থাকবো!

— আজ তো মাংস-ফাংস নেই, সংক্ষেপে কিছু একটা করে দে-না বাবা! রতিলালকে বলে কাল থেকে রান্নার লোক যোগাড় করতেই হবে একটা। নিজেরা রেঁধে খাওয়া যাবে না। আজ এ বেলাটা তুই চালিয়ে দে।

সঞ্জয় বললো, আমি রাঁধতে পারি—কিন্তু সবাইকে এসে রান্নাঘরে বসতে হবে আমি একা থাকবো না। তোরা এসে আলু-পেঁয়াজ কেটে দিবি—বেশিক্ষণ একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।

রতিলাল উনুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি, উনুনে ঠাসা আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ডেকচিতে ভাত চাপিয়ে দিয়ে তার মধ্যেই ওরা আলু আর পেঁয়াজ ফেলে দিলো সেদ্ধ করার জন্য, আজ আর মুর্গী আনা হয় নি, শুধু ভাতে-ভাতই খাওয়া হবে মাখন দিয়ে।

রান্নাঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত। ডেকচি-কড়াই এবং চিনে মাটির বাসনপত্র

ঝকঝকে করে মাজা। রতিলাল লোকটা ফাঁকিবাজ নয়। কিন্তু বউয়ের অসুখে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে।

ভাত যখন প্রায় ফুটে এসেছে, তিনজন স্নান করে নিতে গেছে, এমন সময় রান্নাঘরের পেছনে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ ও মেয়েলি চুড়ির আওয়াজ শোনা গেল। রবি শুধু বসেছিল রান্নাঘরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে উঁকি মারলো। দেখলো, ঝুড়ি হাতে নিয়ে তিনটে সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের আড়ালে, মুখে একটু একটু হাসি। মেয়েগুলো প্রায় সমান লম্বা, সমান বয়েস, সমান কালো রং। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিন্তু ওদের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যেন খানিকটা লজ্জা এবং অপরাধবোধ মিশে আছে। ওদের মধ্যে একজনকে রবি চিনতে পারলো, সেই নীল পাড় শাড়ি পরা মেয়েটি। এরা তিনজনই বাজারের কাছে সেই সিমেণ্টের বেদীতে ঝুড়ি হাতে বসে ছিল। রবি জিজ্ঞেস করলো, কি চাই এখানে? মেয়েগুলো কোনো সাড়াশব্দ করলো না। রবি আর একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, কি চাই তোদের এখানে? মেয়েগুলো এবারও কোনো উত্তর দিলো না, অপরাধী হেসে নতমুখী হলো।

হঠাৎ রবির মুখ–চোখ বদলে গেল, এক ঝলক রক্ত এসে মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখালো, সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে রবি একেবারে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিনা দ্বিধায় সেই নীল পাড় মেয়েটির হাত নিজের হাতে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

সেই মেয়েটি এবার উত্তর দিলো, বাবু, তোদের ইখেনে কোনো কাম দিতে পারিস?

রবি আলতোভাবে মেয়েটির মসৃণ চিবুক তুলে ধরে বললো, এখানে তোরা কি কাজ করবি রে পাগলী? অ্যাঁ?

যেন রবিই এই জগৎ–সংসারের সবকিছুর মালিক, সেই হিসেবেই মেয়েটি তার কাছে অভিযোগ জানালো, পাঁচদিন কোনো কাম মিললো নাই তো কি করবো? রেলের বাবুরা গুদাম বানাইছিল তো কাম মিলছিল, সেও তো বন্ধো করলো—

রবির শরীরটা যেন কাঁপছে, চোখ দুটো যেন ফেটে আসবে, কিন্তু গলার স্বর আশ্চর্য স্নেহময়, নালিশ-করা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বললো, ইস্, কি সুন্দর তোকে দেখতে, আয়, আয়—

— তিনজনাকেই লিতে হবে কিন্তুক। আমরা ঘর সাফা করবো, পানি তুলে দুবো।

— তোদের কিছু করতে হবে না। আয়, আয়—

— দু'টাকা রোজ লিই।

রবি মেয়েটির দু'কাঁধে তার দু'হাত রাখলো, আদুরে ভঙ্গিতে বললে, দু'টাকা? এত সুন্দর তোকে দেখতে—

মেয়েটা রবির হাত ছাড়িয়ে সরে গেল না। শুধু একটু ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার বুক দুলছে। অভিমানীর মতন দাঁড়িয়ে রইলো। অন্য দু'টি মেয়ে একটু আড়ষ্ট, তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমরা সব কাম পারবো বাবু, কাপড় কাচা করে দুবো, জুতা ভি পালিশ করতে জানি— দু'টাকা রোজ দিবি—

— দেবো, দেবো, আয় ভেতরে আয়।

গলার আওয়াজ পেয়ে এবার শেখর উঁকি মেরেছিল, সদ্য স্নান সেরেছে, এখনো তার পরনে শুধু তোয়ালে, শেখর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো এই রবি ও কি করছিস?

রবি মুখ ফেরালো, সম্মোহিতের মতন রহস্যময় তার মুখ, অদ্ভুত ধরনের হেসে প্রায় ফিসফিস করে বললো, এরা কাজ চাইতে এসেছে। নিজে থেকে এসেছে, বিশ্বাস কর, নিজে থেকে—

শেখর কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো। একটি মেয়ের কাঁধে তখনো রবির হাত দেখে একটু হেসে চোখ দিয়ে রবিকে নিষেধ করলো। তারপর বললো, তোমরা এখানে কি কাজ করবে?

এখানে তো কোনো রাজমিস্ত্রির কাজ হচ্ছে না। আমরা দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি—

মেয়ে তিনটিই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলো, আমরা সব কাম পারবো বাবু! দু'টাকা রোজ দিবি—পাঁচদিন আমাদের কোনো কাম মেলে নি—

রবি সোৎসাহে বলে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব কাজ পারবে! কি সুন্দর মুখখানা দ্যাখ!

শেখর একটু অবাক হলো, রবির মুখের চেহারা গলার আওয়াজ, সবই যেন কি রকম বদলে গেল। অত্যন্ত উত্তেজনায় রবি কাঁপছে। শেখর এক মুহূর্তে নিজের বয়সের চেয়েও ঢের বেশি বয়স্ক হয়ে গিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললো, তারপর বললো, না, এদের বাংলোয় রাখা যাবে না। গণ্ডগোল হবে!

রবি বললো, না, না, কিছু গণ্ডগোল হবে না। রবি সেই মেয়েটিকে প্রায় আলিঙ্গন করে বললো, আয় রে, তোরা সব ভেতরে আয়। দু'টাকার অনেক বেশি পাবি।

শেখর দ্রুত এগিয়ে এসে ঝটকা দিয়ে রবিকে সরিয়ে বললো, ভাগ্! ওসব মতলব মোটেই করিস না।

রবি পরম অনুনয়ের ভঙ্গিতে শেখরের হাত ধরার চেষ্টা করে বললো, এরা কাজ চাইতে এসেছে, এরা খেতে পাচ্ছে না, বুঝছিস না—

— আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই—এই, তোমরা যাও।

— অনেক কাজ আছে। কী রকম সুন্দর দেখতে, আঃ, কল্পনা করা যায় না।

— বাজে বকিস না। এই, তুমলোগ যাও না! বোলতা হায়—ইধার কুছ কাম নেহি হায়।

অসীম সাড়া পেয়ে এসেছিল। রবি এবার অভিমানী শিশুর মতন ঝাঁঝালো গলায় বললো, শেখর তোর এটা বাড়াবাড়ি। আচ্ছা এদের দিয়ে রান্নার কাজও করানো যায় না? মাত্র দু'টাকা রোজ—আচ্ছা তোরাই বল—আমরা নিজেরা রেঁধে মরছি!

অসীম হাসতে হাসতে বললো, ব্যাপারটা কিন্তু রবি খুব খারাপ বলে নি। রান্নার কাজটা করতে পারে—মেয়েলি হাতের রান্না না হলে কি আর খেয়ে সুখ আছে!

রবি উৎসাহিত হয়ে মেয়েদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তোরা রান্নার কাজ পারবি না? খানা পাকানো?

শেখর দৃঢ় স্বরে বললো, আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি কিন্তু। আমি এসব ব্যাপার মোটেই পছন্দ করি না।

— তোর আপত্তি করার কোনো মানে হয় না।

শেখর রবির চোখের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ অসীমের দিকে ফিরে বললো, এই অসীম, তুইও রবিকে তাল দিচ্ছিস কেন? দেখছিস না, ওর মাথা ঠিক নেই!

রবি চেঁচিয়ে উঠলো, বেশি বেশি সর্দারি করিস না—শুধু তোরই মাথা ঠিক আছে, না? তোকে কেউ লিডার করে নি। আমি আমার যা ইচ্ছে তাই করবো! রবি আবার হাত বাড়িয়ে সেই মেয়েটাকে ধরতে গেল।

শেখর ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে রবিকে বাধা দিলো। রবি এবার খানিকটা হতাশভাবে বললো, এবার কি নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে হবে নাকি? তুই কি করছিস শেখর? ওরা নিজেরাই আমাদের কাছে এসেছে—আর আমরা ওদের তাড়িয়ে দেবো?

এই সময় চৌকিদার রতিলাল এসে হাজির হলো, চিন্তা-ভাবনায় তার মুখে অনেক ভাজ, মেয়েগুলোকে দেখেই সে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠলো। চৌকিদারকে দেখে মেয়েগুলোও পিছু হটতে শুরু করেছিল, এবার তারা দ্রুত পালাতে লাগলো। চৌকিদার এদের দিকে ফিরে বললো, এইসব মেয়েগুলোকে ইধার ঢুকতে দিবেন না বাবু। আইনে মানা আছে।

ইয়ারা সব—

রবি বললো, কেন, ওরা এলে হয়েছে কি? তুমি নিজে তো—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শেখর বললো, না, ঠিক আছে, আমিই ওদের চলে যেতে বলছিলাম।

সারা দুপুর রবি গুম হয়ে রইলো, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে চাইলো না। বারান্দায় একা ইজিচেয়ারে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইলো। বিকেলবেলা বেড়াতে যাবার প্রস্তাবেও রবি বিশেষ সাড়া দিলো না, উদাসীনভাবে বললো, তোরা ঘুরে আয়। আমি আর আজ যাবো না।

সঞ্জয় একটা ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প খুলে নিয়ে বসেছিল, সেও রবির কথা শুনে বললো, তাহলে আমিও যাবো না, বইটা না শেষ করে পারছি না। অসীম আর শেখরই বেরোলো, যাবার আগে অসীম বক্রহাস্যে বললো, রবির বোধহয় আজ তপতীর কথা মনে পড়ে গেছে!

শেখর বললো, থাক ও কথা, ও কথা বলিস না। রবি আরও রেগে যাবে।

—আজকাল আর রাগে না। তপতীর নাম শুনলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

— ক'বছর হলো রে?

— চার বছর। তপতীর বিয়ে হয়েছে সিক্সটি ওয়ানে—

— সত্যি, মেয়েটা বড় দুঃখ দিয়েছে রবিকে। আমি হলে আরও ভেঙে পড়তুম।

বেড়াতে আর কোথায় যাবে, সেই তো একই জঙ্গল। জঙ্গলে বেশিক্ষণ বেড়াতে ভালো লাগে না জল যেমন অন্য জল দেখলেই গড়িয়ে যেতে চায়, মানুষও সেইরকম মানুষ চায়। কিছুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা আবার এলো সেই পাকা রাস্তায়, দু'জনে কোনো যুক্তি করে নি—তবু ওরা সেই মহুয়ার দোকানেরই পথ ধরলো। যাবার পথে চোখে পড়লো, সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাক থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। অসীম বললো, ওখানে কারা রয়েছে চল তো দেখে আসি?

নিবন্ত উনুন থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সেই আদিবাসী মেয়ে তিনটি শাল পাতায় ভাত বেড়ে সেখানে সদ্য খেতে বসেছে। ওদের দেখে অভিমানী চোখে তিনজনেই একবার তাকালো, তারপর আবার খাওয়ায় মনঃসংযোগ করলো। দেখেই শেখর বললো, চল!

অসীম তবু দাঁড়িয়ে রইলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তিনটি মেয়ে—তাদের বয়েস পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে যে-কোনো জায়গায়, কিন্তু শরীরে তারা ভরাট যুবতী, তাদের সামনে শাল পাতায় ঢালা শুধু ভাত আর ধুঁধুল সেদ্ধ, নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। দু'জন পুরুষ দাঁড়িয়ে সেই খাওয়া দেখলে—জঙ্গলের মধ্যে তখন আবছা অন্ধকার।

শেখর অসীমের হাত ধরে টেনে বললো, চল!

অসীম তবু নড়লো না, অস্ফুটভাবে বললো, এখানে খাচ্ছে? এদের বাড়ি নেই?

— থাকবে না কেন? কিছু দূরে বোধহয় এদের গ্রাম—সারাদিন কাজ খুঁজেছে আর ফিরে যায় নি।

অসীম পিছন ফিরে কিছুদূর হেঁটে তারপর বললো, দুপুরে তুই ওদের তাড়িয়ে দিলি কেন? তোর গোঁয়ার্তুমি ওরা দুটো খেতে পেতো অন্তত।

— ওদের খাওয়ানোর জন্য অত মাথাব্যথা কিসের রে?

— দুপুরে আমাদের কতগুলো ভাত বেশি হয়েছিল—কুকুরকে খাওয়ালুম। তাতে ওদের তিনজনের অনায়াসে খাওয়া হয়ে যেতো। তুই শুধু এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করলি!

— ভালোই করেছি।

— তার মানে? জঙ্গলের মধ্যে বিকেল পাঁচটার সময় ধুঁধুল সেদ্ধ দিয়ে ভাত গিলছে! আমরা

ওদের দুটো খাওয়াতে পারতুম না?

— দু'দিন আগে আমরা এখানে ছিলুম না। দু'দিন পরেও আমরা থাকবো না। ওদের খাওয়ানোর দায়িত্ব আমাদের নয়!

— এটা তোর বাজে যুক্তি। যে ক'দিন আমরা থাকবো, সে ক'দিন তো খেতে পেতো, কাজের জন্য কিছু টাকাও দিতে পারতুম।

— আমাদের ওখানে থাকলে ওদের দ্বারা কোনো কাজ হতো না। কি হতো, তুই ভালোভাবেই জানিস—

— হলোই বা, তাতেই বা আপত্তি কি? ওরা তো জেনেশুনেই এসেছিল—রবি ওদের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ওরা আপত্তি করে নি। খেতে না পেলে ওসব নীতি-ফিতির কোনো মানে হয় না!

— সেই জন্যই তো আমি আপত্তি করছিলুম। কয়েকটা মেয়ে খেতে পাচ্ছে না বলেই সেই সুযোগ নিয়ে তাদের শরীর আমরা ছেঁড়াছিঁড়ি করবো?

— করতুমই যে তার কোনো মানে নেই।

— তুই রবির চোখ-মুখ লক্ষ করিস নি?

— রবির বুকের মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান রয়েছে তপতীর জন্য। আমার তো তাই মনে হয় এদের নিয়ে কিছুটা ছেলেখেলা করলে রবির পক্ষে ভালোই হতো—কিছুদিন অন্তত তপতীর কথা ভুলে থাকতে পারতো। তুই দিন দিন এত মরালিস্ট হয়ে উঠেছিস কেন?

— মরালিটির প্রশ্ন নয়। তোকে একটা কথা বলি অসীম, মেয়েদের সম্বন্ধে তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা খানিকটা বেশি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একটা মেয়েকে ভোলার জন্য অন্য যে-কোনো একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলে কিছু লাভ হয় না। তাতে অভিমান আরও বেড়ে যায়।

— তোর নিজেরও ব্যথা আছে বুঝি সে রকম?

— ব্যথা কার না আছে? আমার অন্য রকম ব্যথা। সে কথা থাক।

— শেখর, তোকে তোর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই হঠাৎ চেপে যাস কেন বল তো? আমি লক্ষ করেছি, তুই মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে যাস। কি ব্যাপার তোর?

শেখর হা হা করে হেসে উঠে বললো, তুই যে দেখছি গোঁফ খাড়া করে আমার গোপন কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিস! আমার কিছু ব্যাপার নেই।

মহুয়ার দোকানে আজ একটু বেশি ভিড়। তা ছাড়া দৃশ্য প্রায় একই রকম, লাইন দিয়ে সবাই মাটিতে বসে গেছে। আশ্চর্য, সেই মেয়েটার মরদ আজও অজ্ঞান—মেয়েটা টানাটানি করছে তাকে। সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক, এরা মহুয়া খেতে আসে নি, এদের অন্য মতলব। সমস্ত জায়গাটায় একটা অসহ্য ধরনের মিষ্টি গন্ধ।

চাটের দোকানে আজ মেটুলির ঝোল রান্না হয়েছে, ওদের দেখেই দোকানদার হৈ-হৈ করে ডাকতে শুরু করে দিলো। এক বোতল মহুয়া কেনার পর অসীম আর শেখর মেটুলির ঝোল একটুখানি চোখ দেখলো। অসম্ভব ঝাল, শেখর শাল পাতাটা ছুড়ে দিয়ে উস্ উস্ করে হাওয়া টানতে টানতে বললো, বাপস্! আগুন ঝাল, মেরে ফেললে একেবারে! উস্।

দোকানদার হাসতে হাসতে বললো, ঝালই তো ভালো বাবু, মহুয়ার সঙ্গে। ঐ দেখেন না সাঁওতালগুলো কি রকম কাঁচা লঙ্কা খেয়ে ল্যায়, দুটা চুমুক দিন আর ঝাল লাগবে নি।

একবার ঝাল খেলে আরও খেতে ইচ্ছা করে। অসীম বেশি ঝাল খেতে পারে, তার তো আপত্তি নেই-ই। অসীম বললো, এখান থেকেই মেটের তরকারি আর আলুর দম কিনে নিয়ে গেলে হয়,

রাত্তিরে তাহলে আর কিছু খাবার লাগবে না।

কিন্তু শেখর সঙ্গে কোনো টাকা আনে নি। অসীমের সঙ্গে মাত্র পাঁচ টাকা। তাহলে আর মহুয়া কেনাই হয় না। রবির জন্য কিছুটা নিয়ে যাওয়া উচিত। ভিড়ের মধ্যে এক কোণে লখাকে দেখতে পেয়ে অসীম বললো, লখাকে পাঠালেই তো হয়। বাংলোয় গিয়ে সঞ্জয় বা রবির কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনবে।—এই লখা লখা—

ওরা এখানে এসে পৌঁছবার পর থেকেই লখা ওদের সঙ্গে আঠার মতন লেগেছিল। লোকটা এমনিতে বেশ বাধ্য এবং বিনীত, সবরকম ফাই-ফরমাশ খাটতেই রাজি। কিন্তু একটু হাত-টান আছে, জিনিসপত্র কিনতে পাঠালে ফিরে এসে খুচরো পয়সা সহজে ফেরত দিতে চায় না। দিলেও এমন হিসেব দেখায়—যাতে স্পষ্ট কারচুপি ধরা পড়ে। আর কেউ লক্ষ করে নি বিশেষ, কিন্তু রবি এই লখাকে ধমকেছে। এমনিতে রবি টাকা-পয়সার হিসেব গ্রাহ্য করে না—যখন পকেটে টাকা থাকে দু'হাতে ওড়ায়-ছড়ায়, বকশিশ দেবার সময় তার হাতই সবচেয়ে দরাজ। কিন্তু, কেউ তাকে ঠকাচ্ছে টের পেলেই সে বিষম খিটখিটে হয়ে ওঠে।

লখার এবার চোখ লাল, চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, তবু সে অনুগতভাবে এগিয়ে এসে বললো, কী হুজুর!

— তোর বেশি নেশা হয়েছে নাকি? একটা কাজ করতে পারবি?

লখা লাজুক হেসে বললো, নেশা কি, এই তো এইটুকুন, আধপোয়া...ফরমাইয়ে আভি তুরন্ত।

— ঠিক আছে, তুই একবার বাংলোতে গিয়ে বাবুদের কাছ থেকে আমাদের জন্য দশটা টাকা নিয়ে আয়। বাবুদের জন্য এই এক বোতল মহুয়া দিচ্ছি নিয়ে যা, তুই নিজে খবরদার খাবি না, ফিরে এলে তোকে বকশিশ দেবো—

লখা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নাটকীয়ভাবে বললো, আমার বকশিশ চাই না বাবু, আমাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে একটা নোকরি দিন। এখানে কিছু মেলে না।

লখা শেখরের পা ধরতে গিয়েছিল, শেখর বিব্রতভাবে পা সরিয়ে নিয়ে বললো, আরে, আরে, এর বেশি নেশা হয়ে গেছে দেখছি। ছাড়, ছাড়, কলকাতায় চাকরি সস্তা নাকি?

— না বাবু, আমাকে কলকাতা নিয়ে চলুন! এখানে কিছু মেলে না—

লখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। মাতালের চোখে জল দেখলে সবারই হাসি পায়! এমনকি অন্য মাতালরাও হাসে। অসীম ও শেখর পরস্পর চোখাচোখি করে মুচকি হাসলো। শেখর কৌতুকের ছলে জিজ্ঞেস করলো, তুই কলকাতায় যেতে চাস কেন? এখানে তোর বাড়ি-ঘর, খেত-খামার আছে, হাঁস-মুর্গীও পুষছিস—এসব ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কি করবি? ওখানে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় না!

দুঃখিত মাতালের মুখ খুব করুণ, বড় বেশি করুণ বলেই হয়তো হাস্যকর লাগে। সেই রকম মুখ তুলে লখা বললো, খাওয়া তো জনম ভোরই আছে, কিন্তু ইসব জাগায় কোনো টাকা নেই বাবু! কলকাতায় নোকরি করে দুটো পয়সা কামাবো—দু'বছর আগে ঐ শালা মুলিয়া কাহার কলকাতার ফেকটারিতে কাম নিলো—এখন সে হাতে ঘড়ি লাগায়। সিগ্রেট খায়—রোয়াব কি।—আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলুন, আমি আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবো।

ফের সে পা ধরতে আসতেই শেখর বললো, কলকাতায় গিয়ে এ রকম নেশা করবি নাকি? তাহলে পুলিশে ধরবে।

— না বাবু, আমি কিরা করে বলছি, ইসব আর ছুঁবো না। ধরম সাক্ষী—আপনারা রাজা লোক—

অসীম বললো, ঠিক আছে, তোকে আমাদের অফিসে চাকরি করে দেবো, এখন যা তো।

কতক্ষণে আসবি?

— আধা ঘণ্টা, বিশ মিনিট, দৌড়কে যাবো।

দু'ঘণ্টার মধ্যেও লখা এলো না। চাটওয়ালাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে রাখা হয়েছিল, সে আর কারুকে বিক্রি করে নি, তার কাছে লজ্জায় পড়তে হলো। এদিকে পাঁচ সিকে দিয়ে আর এক বোতল মহুয়া খাবার ফলে শেখর আর অসীমের বেশ নেশা হয়ে গেল।

সেই মাতাল মেয়েটা বার বার এসে বলতে লাগলো, এ বাবু, থানায় ধরে লিয়ে যাবি না? লিয়ে চল না, এ বাবু!

অসীম পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বার করে মেয়েটার হাতে ঝরঝর করে ঢেলে দিয়ে বললো, নাচ দেখাবি? নে, নাচ দেখা!

মেয়েটা অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পয়সাগুলো গুনলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দোকান থেকে একটা কোয়াটার বোতল কিনে এনে নিজের অজ্ঞান মরদকে ধাক্কা দিয়ে বললো, লে মুংরা। বাবুলোক খিলালো—। মরদটা সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও মুখ খুললো, এবং মেয়েটা তার ঠোঁটের ফাঁকে বোতলটা ধরতে চুক চুক করে বেশ খেতে লাগলো এবং একটু বাদে আবার চোখ বুজলো। মেয়েটা নিজে বাকি অর্ধেকটা খেয়ে হাতে তালু দুটো বার বার মুছলো নিতম্বের কাছে শাড়িতে। তারপর মাথার ওপর হাত দুটো তুলে তালি বাজাতে বাজাতে বললো, লাচ দেখবি?

মেয়েটা অত্যন্ত লচকে দু'বার কোমর দোলালো, আবার বললো, লাচ দেখবি? বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে ফের সেই প্রশ্ন, লাচ দেখবি? কাল হাটবার, আজ আখুনি লাচ দেখবি? দুটো হাত দু'পাশে ছড়িয়ে সে নিপুণ ছন্দে বুক দোলালো, একটা পা সামনে এগিয়ে দিতে ভোজালির মতন তার উরুর কিছুটা অংশ দেখা গেল, পাগলাটে গলায় সে আবার বললো, লাচ?

নেশা করার সময় এইসব আদিবাসীরা বেশি কথা বলে না। গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ সারার ভঙ্গিতে পাতার ঠোঙায় মদ ঢালে এবং এক চুমুকে শেষ করে ঝিম মেরে বসে থাকে। কথা বললেও বলে আস্তে আস্তে, ফিসফিস করে।

সেই দীর্ঘস্থায়ী অপরাহ্নে শুঁড়িখানার সামনের চাতালে গুটি পঞ্চাশেক লোক নিঝুম হয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। মেয়েটার অতিরিক্ত নির্লজ্জতায় কারুর কারুর মুখ অপ্রসন্ন, কেউ কৌতুক পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব—কিন্তু কোনো কথা বললো না। তা ছাড়া ওরা যেন জানে যে, কলকাতার এইসব ছোকরা বাবুদের নানা রকম পাগলামি থাকে—মুখ বুজে সেগুলো দেখে যাওয়াই ভালো। বাবুরা তাদের সঙ্গে এক জায়গায় বসে মদ খাচ্ছে কেন, অনায়াসেই তো নোকর পাঠিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারতো! সবাই তো তাই করে!

মেয়েটা ঠিক নাচলো না। অসীম তাকে নাচতে বলায় হঠাৎ যেন সে বিষম অহংকারী হয়ে উঠলো। খানিক আগে যে একটু মদের জন্য ভিক্ষে করছিল—এখন সে হঠাৎ রহস্যময়ী হয়ে উঠলো। নাচ শুরু করলো না। কিন্তু যাদুকরীর মতন ভঙ্গিতে অসীমের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তার আঁট শরীরটা দুলিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো, লাচ দেখবি?

যেন সমস্ত নৃত্যকলাকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে, তারপর এক-একটা টুকরো ছুড়ে দিচ্ছে অসীমের দিকে। বুভুক্ষুর মতন অসীম সেই এক-একটা টুকরো লুফে নিচ্ছে। মেয়েটা আর এক পা এগিয়ে এলো অসীমের দিকে, সাপের মতন শরীরটা সামনে পেছনে দোলালো, একবার মাত্র, ভোজালির মতন উরুটা আরেকবার দেখালো, তারপর হাত বাড়িয়ে বললো, দে—।

অসীমের চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এসেছে। পৃথিবীটা একবার মাত্র দুলে উঠলো। সে

অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, কি দেবো?

মেয়েটা ঠিক সেই রকমই দাঁড়িয়ে, যেন নাচের মাঝখানে কোনো এক জায়গায় থেকে গিয়ে চিত্রার্পিত মূর্তি, উরুর কাছে তার হাতটা মা কালীর মুদ্রার মতন, সে আবার তীব্রস্বরে বললো, দে!

অসীম যেন খুব ভয় পেয়েছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে তার দুর্বোধ বিস্ময়, উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, কি? কি?

সাইকেলে হেলান দেওয়া লোক দুটোর সঙ্গে শেখর কথা বলছিল, সেই মুহূর্তে শেখর পেছন ফিরে অসীমের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে চেঁচিয়ে বললো, ডোন্ট টাচ দ্যাট গার্ল অসীম, দ্যাট উইল ইনভাইট ট্রাবল্।

অসীম উন্মত্তের মতন দু'তিন পা এগিয়ে এসে অস্বাভাবিক রকম চিৎকার করে বলে উঠলো, আই ডোন্ট কেয়ার! তুই হুকুম করছিস কেন, আমি তোর হুকুম শুনতে চাই না! আমার যা ইচ্ছে তাই করবো—।

সাইকেলওয়ালা লোক দুটো অন্য প্রদেশী পাইকার ! এইসব অঞ্চলের হাট থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে অন্য প্রদেশে চালান দেয়। কখনো কখনো কুলি-কামিন চালান দেবার ঠিকাদারীর কাজও করে। শেখর ওদের সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতির বিষয়ে আলোচনা করছিল। অসীমের অবস্থা দেখে সে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল।

অসীমের গলার স্বর বদলে গেছে, চোখের দৃষ্টি অচেনা, ঠিক মতন দাঁড়াতে পারছে না। শেখর ওর দু'হাত চেপে ধরে বললো, অসীম, কি যা-তা বলছিস ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর?

অসীম জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, মেয়েটা কী চাইছে আমার কাছে? আমি দেখতে চাই।

—কি আবার চাইবে? চল এবার বাংলোয় ফিরি—নখাটা এলো না—।

—আমি এখন যাবো না !

শেখর মেয়েটার দিকে ফিরে এক ধমক দিয়ে বললো, এই, তুই আবার কি চাস? বাবু তো পয়সা দিয়েছে একবার—এখন যা, ভাগ্ !

মেয়েরা শেখরের কথা গ্রাহ্যই করলো না। স্থিরভাবে চেয়ে আছে অসীমের দিকে। অসীমের চোখও চুম্বকের মতন মেয়েটার দিকে আটকানো। ক্রুদ্ধ বাঘের লেজ আছড়ানোর মতন মেয়েটা সমস্ত শরীরটা মুচড়ে আর একবার নাচের প্রাক্‌ভঙ্গি করলো। সম্মোহন করার মতন হাত বাড়িয়ে বললো, এবার দে ! দিবি না?

অসীম চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, কী দেবো ? কি?

শেখরের দিকে ফিরে আবার বললো, কী চায় ? কী দিতে বলছে ?

শেখর মেয়েটাকে গ্রাহ্যই করছে না, কিন্তু অসীমের পরিবর্তনে সে খুবই অবাক হয়। শান্তভাবে অসীমকে বোঝাতে চায়, কিছু না—আমাদের মাতাল ভেবে—।

—না, না, ও কি যেন বলতে চাইছে !

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, না দিয়ে তুই যাবি কোথায় ? দিতে হবে—

অসীম হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে ধরার চেষ্টা করতেই শেখর ওকে বাধা দেয়।

—কিছু না। একদম বাজে মেয়েছেলে, এখানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিপদ হবে বলছি।

—বিপদ ! আমার কোনো বিপদ হবে না। কত বড় বিপদ আমি কাটিয়ে এসেছি, তুই জানিস না? আমি একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম।

—কি যা-তা বকছিস ! চল এবার।

—মোটেই যা–তা বকছি না। তুই জানিস না?

—তখন তোকে অতটা খেতে বারণ করলুম। সহ্য করতে পারিস না যখন—তখন এতটা খাস কেন? একটু খেয়েই বকবক—

অসীম আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে শেখরকে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, বাজে বকবক করছি না মোটেই, কেউ জানতে পারে নি, আমি একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম—আঃ রক্ত, কি রক্ত—

—সেটা খুন নয়, দুর্ঘটনা। তুই এত দিনেও—

—আলবত খুন। আমি নিজে—

এখানে সবাই বাংলা বোঝে, অসীমের চিৎকারে সবাই উৎকর্ণ, সাইকেলে হেলান দেওয়া লোক দুটো চোখ সরু করে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে আছে। শেখর আর উপায়ান্তর না দেখে অসীমের কলার ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বললো, কি, হচ্ছে কি? অসীমের চৈতন্য শেষ সীমায় এসেছিল, ঐ ঝাঁকানিতেই সে মাটিতে ঝুপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

মেয়েটা থুতনিতে আঙুল দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, যেন তার ঐ বিস্ময়ও নাচেরই একটা ভঙ্গি। এবার সে ঘরে গিয়ে নিচু হয়ে বললো, লে মুংরা, তু–ও বেহোঁশ, বাবু ও বেহোঁশ আর একটো বাবু পাগলা—হি–হি–হি–হি—। তার হাসির শব্দ এখন তীক্ষ্ণ যে, চাটওয়ালা ওদিক থেকে ধমকে উঠলো, এ সুরি, আভি চুপ যা, বেহুদা রেণ্ডি কাঁহাকা!

শেখর বিপন্নভাবে এদিক ওদিক তাকালো। যদি লখাটা এখনো আসতো।—কিন্তু তার কোনো পাত্তা নেই। শেখর চাটওয়ালাকে বললো, এক ঘটি জল দেবে ভাই?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে নেমে এসে বললো, চলিয়ে না, আমি বাবুকে আপনা সাথ পৌছা দিয়ে আসছি।

শেখর উৎসাহিত হয়ে বললো, তাহলে তো খুব ভালো হয়। তুমি আমার সঙ্গে গেলে মাংসের দামটা দিয়ে দেবো ওখানে।

—দামের জন্য কি! আপলোক রাজা আদমি। কাল দাম লিয়ে লিতম।

—না, কাল আর এখানে আসবো না।

চোখ–মুখে খানিকটা জলের ঝাপটা দিতেই অসীমের জ্ঞান ফিরলো। দুর্বলভাবে খানিকটা হেসে বললো, কী? অজ্ঞান হয়েছিলাম? কখন?

শেখর বিরক্তির সঙ্গে বললো, এখন ফিরতে পারবি তো?

—হুঁ।

অসীম চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলো, মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলো, মেয়েটা কি চাইছিল রে?

—মাথা আর মুণ্ডু! নে, এখন ওঠ।

অসীম তবু আচ্ছন্নের মতন বসে রইলো। দু'হাতের তালু দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ কচলে সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে আবার আবছা আলোয় ফিরে এসে বললো, জানিস শেখর, আমি হঠাৎ খুব ভয় পেয়েছিলুম! ঐ মেয়েটা কি হিপ্‌নোটিজম্ জানে?

শেখর বললো, কি আবোল-তাবোল বকছিস! মেয়েটা আরও কিছু পয়সা বাগাবার তালে ছিল।

মাংসওয়ালা শেখরের কথায় সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ বাবু, ঠিক বলিয়েছেন ও ছোক্‌রিটা একেবারে বে–হুদা বেশরম্!

অসীম সব কথা মন দিয়ে শুনছিল না। বার বার তাকাচ্ছিল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা তীক্ষ্ণ

চোখে অসীমের দিকেই তাকিয়েছিল। শেখর অসীমকে ধাক্কা দিয়ে বললো, কি রে, মাথাটা একেবারে খারাপ করে ফেলবি নাকি?

—আমার মাথাটা সত্যি গুলিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন আমার কাছে এসে প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

শেখর ধমকে উঠলো, প্রতিশোধ আবার কি? যত রাজ্যের আজে বাজে কথা মাথায় ভরে রেখেছিস।

সন্ধে গাঢ় হয়ে উঠেছে। দোকানের সামনে জ্বলে উঠেছে হ্যাজাক। সেটার থেকে আলোর বদলে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশি। রকের ওপর অসীম আধ-শোয়া, তার দু'পাশে শেখর আর মাংসওয়ালা—যেন একটা নাটকের দৃশ্য, অন্য লোকগুলো সেইভাবেই আছে ওদের দিকে। অসীম আপন মনেই বললো, না, মেয়েটা পয়সা চায় নি! ওকে নাচ দেখাতে বলুম, তার বদলে ও কি রকম আমার সামনে দাঁড়িয়ে—যেন ও আমার সব গোপন কথা জানে, সবার সামনে আমাকে—।

—ওসব কিছু আমি শুনতে চাই না। এখন যাবি কি না বল!

দু'জনে দু'দিক থেকে তুলে ধরতেই অসীম নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো, শার্ট-প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে অকারণে বিরক্ত মুখে বললো, দূর-ছাই! তারপর মেয়েটার দিকে আর না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল একাই। কিছুটা রাস্তা আসতেই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলো। আরও খানিকটা এসে অসীম রাস্তার ধারে হড় হড় করে বমি করলো। তারপর থেকে সে আবার হালকা স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গান ধরলো।

সেই গানের সঙ্গে শেখর যোগ দিলো না। বন্ধুদের মধ্যে একজন কেউ মাতাল হয়ে গেলে অন্যদের নেশা কেটে যায়। অসীমকে সামলাতে গিয়ে শেখরের সব মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। শেখর এখন গম্ভীরভাবে অপ্রসন্ন মুখে হাঁটছিল। ঐ মেয়েটার কথা শেখর এবার নিজেও একটু ভেবে দেখলো। মেয়েটার ব্যবহার সত্যিই খানিকটা রহস্যময় অদ্ভুত। কিন্তু জঙ্গলের মানুষের রীতি-নীতি তো খানিকটা আলাদা হবেই।

মাংসওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, শেখর তাকে জিজ্ঞেস করলো, জঙ্গলের মধ্যে কোনো সর্ট-কাট আছে কিনা। লোকটি জানে, ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। টর্চ নেই, এখানে নিবিড় অন্ধকার, মাঝে মাঝে চাঁদভাঙা আলো। পরস্পরের পায়ের শব্দ শুনে শুনে ওরা হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ অসীম একটা ফুলগাছের সামনে দাঁড়ালো। গাছটা একটু অদ্ভুত, কাঁধ-সমান উঁচু—কিন্তু গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু থোকা থোকা সাদা ফুল। অসীম জিজ্ঞেস করলো, এটা কী ফুলগাছ?

মাংসওয়ালা বললো, কি জানি বাবু? তবে, সাঁওতালগুলাক্ তো ই ফুলকে বলে নিমিঠু। পরবের দিনে ওরা এ ফুল মাথায় দেয়!

শেখর একটা থোকা ভেঙে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো। এতক্ষণ বাদে সে পরিপূর্ণ গ্লানিমুক্ত গলায় বললো, আঃ! কি সুন্দর গন্ধ—আগে তো এ ফুল দেখি নি!

৫

বাংলোর ঘরে আলো জ্বলে নি, বারান্দাও অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই রবি আর সঞ্জয় চুপ করে বসে আছে ইজিচেয়ারে। অসীম চেঁচিয়ে উঠলো, কি রে, তোরা অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছিস কেন?

রবির গলা তখনো থমথমে সে গম্ভীরভাবে জানালো, বারান্দার আলো জ্বালিস না।

শেখর ঘরের ভেতর থেকে টাকা এনে চাটওয়ালাকে বিদায় করলো। তারপর আবার বারান্দায় এসে, চোখে পড়লো টেবিলের ওপর প্লেটে চিবানো মাংসের হাড়। শেখর জিজ্ঞেস করলো, এ কি, মাংস—

—তোমার বান্ধবী দরওয়ানের হাত দিয়ে কাটলেট পাঠিয়ে ছিলেন বিকেলবেলা। তোমাদের দু'জনেরটা ঘরে ঢাকা আছে।

—এদিকে আমরাও যে মাংস নিয়ে এলুম। আরে, এ কি, রবি—

এতক্ষণ লক্ষ করি নি, এবার আবছা আলোয় শেখর দেখলো, রবি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে আছে। তার জামা-প্যান্ট, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া সব, চেয়ারের হাতলে জড়ো করা। শেখর এবার হাসতে হাসতে বললো, এ কি রে, তুই রাগ করে শেষ পর্যন্ত—

—রাগের কি আছে ! গরম লাগছিল।

—গরম লাগছে বলে একেবারে ত্রৈলঙ্গস্বামী?

ব্যাপারটাতে অসীম খুব মজা পেয়ে গেল। সে উল্লাসের সঙ্গে বললো, ঠিকই তো, জঙ্গলের মধ্যে রাত্তির বেলা এসব ঝামেলা—আয় আমরাও খুলে ফেলি—। অসীম অবিলম্বে নিরাবরণ হয়ে গিয়ে শেখরের জামা ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো। শেখর বললো, আরে, আরে, টানিস না, খুলছি খুলছি—।

অসীম ডাকলো, সঞ্জয়, এই সঞ্জয়!

সঞ্জয় চোখ বুজে ছিল, এবার বিরস গলায় বললো, আমাকে বিরক্ত করিস না, আমার ভালো লাগছে না।

—কেন রে, তোর কি হলো!

—আমার এখানে আর ভালো লাগছে না। আমি কাল চলে যাবো। এসব আমার পছন্দ হয় না—রবি আজ সেই লোকটাকে মেরেছে।

শেখর আর অসীম প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করলো, কাকে মেরেছে?

সঞ্জয় বললে, ঐ যে আমাদের সঙ্গে এসেছিল, কি নাম যেন—লখা! লোকটা এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ...

—কেন, তাকে মেরেছে কেন?

রবি হুংকার দিয়ে উঠলো, মারবো না? লোকটা চিট, আমাকে ঠকাতে এসেছিল। তোদের নাম করে আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল।

শেখর চমকে উঠে বললো, সে কি রে, আমরা যে সত্যিই ওকে পাঠিয়েছিলাম।

—মোটেই না। আমি ওকে দেখেই বুঝেছিলাম আমাকে ঠকাতে চাইছে।

পোশাক না পরা পুরুষের শরীর কি রকম যেন দুর্বল আর অসহায় দেখায় ! বিশেষত ঐ অবস্থায় ইজিচেয়ারে বসে থাকার মধ্যে একটা হাস্যকরতা আছে। রবি খানিকটা বেঁকে বসে আছে—তার ছিপছিপে কঠিন দেহ—কোথাও একছিটে চর্বি নেই, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সাদা পোশাকে তাকে অপরূপ লাবণ্যময় দেখায়—মনে হয়, সেইটাই তার আসল চেহারা, নিরাবরণ শরীরে রবিকে এখন অচেনা মনে হচ্ছে। কোনো একটা ব্যাপারে রবি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে। রবি মানুষকে ধমকাতে ভালোবাসে, হঠাৎ তো কারুকে মারতে চায় না ! শেখর জিজ্ঞেস করলো, লখা এসে আমাদের নাম করে বলে নি?

রবি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আমি জানি লোকটা জোচ্চোর!

—না রে, আমরা মাংস কিনবো, টাকা ছিল না, তাই ওকে পাঠালাম। ওর হাত দিয়ে এক

বোতল মহুয়াও পাঠিয়েছিলাম দেয় নি?

সঞ্জয় বললো, হ্যাঁ, সেটা রবি একাই শেষ করেছে।

রবি আবার তেড়ে উঠলো, এক বোতল ছিল না, আধ বোতল ঐ হারামজাদা নিজে খেতে খেতে এসেছে—

পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা সঞ্জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে বললো, আমি রতিলালের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম—লোকটা খুব বিপদে পড়েছে, বৌয়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। আমি ওর সঙ্গে গেলাম, ওর বৌটা বাঁচবে না, কি হয়েছে কে জানে—পেটটা বিষম ফুলে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলছে হাঁপরের মতন, পাশে তিনটে বাচ্চা। বাড়িতে এ রকম অসুখ, অথচ রতিলালকে দিয়ে আমরা জল তোলাচ্ছি, উনুন ধরাচ্ছি—বিচ্ছিরি লাগছিল ভেবে—তার ওপর, আমরা বে-আইনিভাবে বাংলোটা দখল করে আছি। আমাদের জন্য লোকটার যদি চাকরি যায়—

অসীম অধৈর্য হয়ে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা, রতিলালের কথা পরে শুনবো। লখার সঙ্গে কি হলো বল না।

সঞ্জয় একটু জ্বালা মিশ্রিত দুঃখের সঙ্গে কথা বলছিল, অসীমের অধৈর্য উক্তি শুনে এক পলক আহতভাবে তার দিকে তাকালো। ফের বললো, ফিরে এসে দেখি রবি লখাকে ধরে পেটাচ্ছে। আমি বাধা না দিলে হয়তো রক্তারক্তি করতো। তারপর এক বোতল মদ গিলে, অসভ্যের মতন জামা কাপড় সব খুলে—আই ডিটেস্ট অল দিজ—একটা সভ্যতা ভদ্রতা বলে ব্যাপার আছে।

রবি বললো, জঙ্গলে এসে আবার সভ্যতা কি রে?

—আমরা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি, জংলী হতে আসি নি। আমরা যেখানেই যাই, আমরা সভ্য মানুষ।

শেখর বাধা দিয়ে বললো, সত্যি তোরা এমন এক একটা কাণ্ড করছিস, শেষ-পর্যন্ত একটা বিপদ-আপদ না-হয়ে যাবে না দেখছি। লখা যদি দলবল নিয়ে আমাদের মারতে আসে?

রবি বললো, যা যা, ক'জন আসবে, আসুক না!

অসীম বললো, অত ভাববার কি আছে! ও রকম মার খাওয়ায় ওদের অভ্যেস আছে। লখা আমার কাছে কলকাতায় চাকরি চেয়েছে, আমি দেবো বলেছি, সেই লোভেই সব সহ্য করবে। কলকাতায় চাকরি নিলে কত লাঠিঝ্যাটা খেতে হবে—এখান থেকেই সেটা বুঝে নিক!

সঞ্জয়ের গলায় যুগপৎ দুঃখ ও অভিমান, সে অনেকটা আপন মনেই উচ্চারণ করলো, গ্রাহ্য করি না, কোনো মানে হয় না, আমরা মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করি না, শুধু নিজেদের আনন্দ ফুর্তি, কোনো মানে হয় না, ভাল্‌গার—

—এমন কিছু করা হয় নি, তুই আবার বাড়াবাড়ি করছিস!—

অসীম জানালো, জানিস রবি, সেই মেয়েগুলোকে সন্ধ্যাবেলাও দেখলাম—

—কোন মেয়েগুলো? কোথায়?

সেই দুপুরে যে-তিনজন এসেছিল, তাদের দেখলাম সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাকে বসে ধুঁধুল দিয়ে ভাত খাচ্ছে।

রবি চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো, আবেগের সঙ্গে বললো, সেই তিনজন? মিলিটারি ব্যারাকে? ওরা নিজের থেকে এসেছিল, আমরা তখন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—

রবি এবার তড়াক করে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে আর একটি কথাও না বলে অন্ধকারে ছুটলো। শেখর চেঁচিয়ে উঠলো, এই রবি, কোথায় যাচ্ছিস?

রবি কোনো সাড়া দিলো না। দূরে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ! শেখর বললে, আরে, ছেলেটা

পাগল হয়ে গেল নাকি? অসীম, আয় তো—

ওরা দু'জনেও বারান্দা থেকে নেমে ছুটলো। অরণ্যের স্তব্ধতা বড় কঠোর ভাবে ভেঙে যেতে লাগলো। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, শুধু পায়ের শব্দ, রাত্তিরবেলা এ রকম পদশব্দ জঙ্গলে সপরিচিত। শেখর চেঁচালো, রবি রবি—। কোনো সাড়া নেই। অসীম, তুই কোন দিকে? রবি কোথায় গেল?

বুঝতে পারছি না।

—রবি, ফিরে আয়, এখন ওরা ওখানে নেই।—লতার ঝোঁপে পা আটকে পড়ে গেল শেখর। হাতের তালুতে কাঁটা ফুটেছে। দু'এক মুহূর্ত চুপ করে কান পেতে শুনলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটু বাদে পাশেই খরখর করে শব্দ হলো, সেদিকে দ্রুত হাত বাড়িয়ে মনুষ্য শরীর পেয়ে শেখর চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠে অসীম বললো, আমি, আমি—। রবিকে ধরতে পারবি না, ও ক্রিকেটে সর্ট রান নেয়।

—ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়? কত রকম বিপদ হতে পারে, কিছু একটা হলে ওর মাকে কী বলবো?

—ঐ যে ডান দিকে শব্দ হচ্ছে।

শেখর আবার উঠে ছুটলো। আবার পাতা ভাঙার শব্দ, চিৎকার, রবি, রবি, এখানে আয় বলছি—

অসীমের বদমায়েশী হাসি, রবি, থামিস না, চলে যা—

—এই অসীম, দাঁড়া, তোকে একবার হাতের কাছে পাই—

—শেখর, এত সিরিয়াস হচ্ছিস কেন? বেশ মজা লাগছে মাইরি, ইয়া—হু, আমি টার্জন, আব-আব-আব, রবি, তাড়াতাড়ি পালা।

—অসীম, আমাকে ধর, আমার পা মচকে গেছে।

—ধ্যাৎ তেরি। মচকে গেছে তো পড়ে থাক, আমার—

তেমন বেশি আঘাত লাগে নি শেখরের। তবু ও আর উঠলো না। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। পিঠের তলায় ভিজে ভিজে মাটি আর শুকনো পাতা ভারী আরাম লাগছে। যেন কত কাল এ রকমভাবে শোওয়া হয় নি, শরীর যেন এর প্রতীক্ষায় ছিল। কোনো আলাদা গন্ধ নেই, সব মিলিয়ে একটা জংলী গন্ধ ভেসে আসছে। ভুক্ ভুক্ ভুক্ করে একটা রাত-পাখি হঠাৎ ডেকে উঠলো। মাঝে মাঝে অসীম আর রবির দু'এক টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে। শেখরের আর ইচ্ছে হলো না ওদের ডাকতে। তার বদলে এই অন্ধকার জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকার একটা মাদকতা বোধ করলো।

পোশাক খুলে ফেলার পর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও যেন আর কিছু গোপন রাখতে চায় না। রবি কেন অত ছটফট করছে শেখর জানে। ওর আঘাত আর দুঃখ, শহরে যা গোপন রাখা যায়, এই অরণ্যে এসে তা আরও বিশাল হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দূর-ছাই, যা হবার হোক!

হঠাৎ অসীমের ত্রস্ত ডাক ভেসে এলো দূর থেকে, এই রবি, ওদিকে যাসনে, গাড়ি আসছে! শেখর ধড়মড় করে উঠে বসলো।

এক ঝলক প্রবল আলো ও একটানা একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। ওরা বড় রাস্তার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, দূরে দুটো ট্রাক আসছে। হেড লাইটের আলোয় মাঝরাস্তায় রবির দীর্ঘ, ফরসা, উলঙ্গ দেহটা একবার দেখা গেল! কে জানে, ট্রাক ড্রাইভাররা ভূতের ভয় পেয়েছিল কিনা, তারা গাড়ির স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলো। শেখর চিৎকার করে উঠলো, রবি, সাবধান—।

ট্রাক দুটো চলে যাবার পর আরও বেশি অন্ধকার। একটু বাদে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবার পর শেখর আর অসীম রাস্তার এ-পারে এলো। রবি এক ধারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। না, কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না, রবি মাঝরাস্তা থেকে অনেক দূরে। শেখর ঝুঁকে পড়ে জননীর মত স্নেহে রবির কপালে হাত রেখে ডাকলো, রবি, রবি—

রবি পাশ ফিরে বললো, উঁ। আমার হাঁটুতে খুব লেগেছে।

—কেটে গেছে? চল, আমার কাছে পেনিসিলিন আয়ন্টমেন্ট আছে, দাঁড়াতে পারবি তো?

—ঘষড়ে গেছে, জ্বালা করছে খুব। হ্যাঁ, দাঁড়াতে পারবো।

অসীম বললো, রবি, তোকে মাঝরাস্তায় আলোতে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল, গ্রীক দেবতার মতন—।

ক্লিষ্ট হেসে রবি বললো, আয় না একটু বসি—কী সুন্দর জায়গাটা!

—আবার কোনো ট্রাক গেলে যদি আমাদের গায়ে আলো পড়ে—শেখর এতক্ষণে হাসলো।

—না, আলো দেখলে আমরা সরে যাবো। আজ সারাদিন আমার বড্ড মন খারাপ ছিল রে।

ঘাসের ওপর বসলো তিনজনে। শেখর রবির ডান পা-টা টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখলো। হাঁটুর কাছে অনেকখানি ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ঘোরের মাথায় ছুটছিল রবি, হঠাৎ ট্রাকের হেড লাইটের আলো চোখে পড়ায় দিশাহারা হয়ে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে রগড়ে রবির পায়ে লাগিয়ে দিলো শেখর।

এতক্ষণ বাদে অনেকটা চাঁদের আলো উঠেছে। চওড়া পীচের রাস্তাটা দু'দিকে যতদূর দেখা যায়, সোজা মিলিয়ে গেছে ধূসরতায়। জঙ্গলের চূড়ার দিকটা দৃশ্যমান হলেও মাঝখানে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এক ধরনের লুকোচুরি খেলার বাতাস কোনো কোনো গাছকে দুলিয়ে যাচ্ছে—বাকি বৃক্ষগুলো নিথর। দূরে, অনেক দূরে দুটো শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠলো। সেই ডাক শুনে অসীম সচকিত হয়ে বললো, এদিকে আসবে নাকি?

রবি ভ্রূক্ষেপ করলো না, বললো, ওগুলো তো শেয়াল!

শেখর চোখ তীক্ষ্ণ করে জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে তাকালো। আলো জ্বলা হয় নি, ডাকবাংলোটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বললো, সঞ্জয়টা ওখানে একলা রইলো!

অসীম ঝাঁঝালো গলায় বললো, ও এলো না কেন আমাদের সঙ্গে? ওর আসা উচিত ছিল! জঙ্গলে বেড়াতে এসে ও ভারি সভ্যতা ফলাচ্ছে! একসঙ্গে বেড়াতে এসেও এ রকম একা একা থাকার কোনো মানে হয় না!

অপ্রত্যাশিতভাবে রবিই উত্তর দিল, সঞ্জয়ের দোষ নেই। ওর ব্যাপার আমি জানি। মাসখানেক ধরে ওর মেজাজটা খুবই খারাপ হয়ে আছে—কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। সঞ্জয়টা খুব ভালো ছেলে তো—

কনুইতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে শেখর বললো, তোদের তিনজনেরই দেখছি মেজাজের ঠিক নেই! আমার কিন্তু বেশ লাগছে এ জায়গাটা। কি চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে!

অসীম বললো, ইস্, সিগারেট নেই, সিগারেট থাকলে আরও ভালো লাগতো!

শেখর অসীমের নগ্ন নিতম্বে একটা লাথি কষিয়ে বললো, তোর জন্যেই তো! তুই-ই তো জোর করে জামা-প্যান্ট খোলালি! এখন যা, বাংলো থেকে সিগারেট নিয়ে আয়।

—এই অন্ধকারের মধ্যে আমি একা যাবো? আমার বয়ে গেছে—

—রবি, তুই দৌড়োতে দৌড়োতে কোথায় যাচ্ছিলি? তোর কি ধারণা, সেই ভাঙা ব্যারাকে মেয়েগুলো এখনো তোর জন্যে বসে আছে?

—আমি যাবো জানলে ওরা ঠিকই বসে থাকতো! তোর জন্যেই তো দুপুরবেলা ওদের

তাড়িয়ে দিতে হলো —

—থাকলেও, তুই এই অবস্থায় তিনটে মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস? তোর কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—তাতে কি হয়েছে? জঙ্গলের মধ্যে, রাত্তিবেলা—এখানে কোনো ভণিতার দরকার হয় না। ওরা তো আর তোদের সেই ন্যাকা শহুরে মেয়ে নয়! এখানে ওরা যা চায়, আমি যা চাই—সবই সোজাসুজি—

—বুঝলুম! তার মানে, আজ আবার তপতী তোকে খুব জ্বালাচ্ছে!

—তপতী?

রবির চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল চোয়াল, হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরে শেখরের দিকে একদৃষ্টে তাকালো। তারপর বললো, তপতী? খবরদার, আমার সামনে আর তপতীর নাম উচ্চারণ করবি না!

—চার বছর হয়ে গেল, এখনো এত রাগ?

—তুই জানিস না! তুই কিচ্ছু জানিস না! তপতী আমাকে—

কাচের জানলা, কাচের দরজা, তাই অতি ভোরের সূর্য যখন রক্তবর্ণ, তখনই আলোয় বাংলোর দু'খানা ঘর ভরে যায়। এক ঘরের খাটে সঞ্জয় আর শেখর, অন্য ঘরে অসীম আর রবি, চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখা যায়। রবির লম্বা শরীরটা কুঁকড়ে আছে—শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেখরের মুখখানা যেন বিষদাচ্ছন্ন, বোধহয় কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখেছে একটু আগে।

বারান্দায় খাবারের ভাঁড়টা ভর্তিই পড়ে আছে, অসংখ্য কালো পিঁপড়ে সেটাকে ছেঁকে ধরেছে। থামের পাশে পড়ে আছে রক্তমাখা তুলো, ঐখানে বসে কাল রবি পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছিল।

সিঁড়িতে একটা বড় কোলা ব্যাঙ বিহ্বলের মতন এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছিল, এবার সে থপ্ থপ্ করে নিচে নেমে গেল। নেমে গিয়ে ব্যাঙটা দু'তিনটে মল্লিকা ফুলের চারার গায়ে ধাক্কা মারলো, কেঁপে উঠলো ফ্রক-পরা মেয়েদের মতন মল্লিকা ফুলগুলো—তাদের গা থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়লো কয়েক ফোঁটা শিশির। কী একটা পাখি ডেকে উঠলো টু-চি-টু, টু-চি-টু, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক শালিক তার উত্তর দিলো, কুরু-রাং কু-রু-রাং কু-রু-রাং—। ভোরবেলায় পৃথিবীকে প্রত্যেকদিন মনে হয় পবিত্র নির্মল।

প্রথমে রবির ঘুম ভাঙলো। চোখ ঘুরিয়ে একবার এদিক-ওদিক তাকালো, যেন তার মনে ছিল না, সে কোথায় শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে উঠে গিয়ে পা-জামাটা পরে নিলো এবং অসীমকে ধাক্কা দিয়ে বললো, এই অসীম, ওঠ ওঠ, আজ আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন আছে। অসীম চাদর সরিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়েই রবির দিকে ঘাড় ঘোরালো—সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ হাসিতে তার চোখ-মুখ ভরে গেল। আবার চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়ে বললো, দাঁড়া, আর একটু ঘুমিয়ে নি। এক্ষুনি কি!

পাশের ঘরে শেখরের ঘুম ভাঙলো আস্তে আস্তে। প্রথমে চোখ খুললো, তখন শুধু ওর চোখ দুটোই জেগে উঠেছে, বাকি শরীরটা ঘুমন্ত। আলসভাবে শেখর তাকালো জানলার বাইরে। রান্নাঘরের দিকে বিশাল কালোজাম গাছটা হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, তাতে এক একবার ঝিকমিকে রোদ এসে পড়ছে শেখরের মুখে, এক একবার পাতার ছায়া! তিনটে সাদা বক

জামগাছটার ডালে বসে রোদ পোহাচ্ছে। এবার শেখর ওর হাতেরও ঘুম ভাঙালো। ডান হাতটা খুলে পাশের খাটের দিকে নিয়ে সঞ্জয়ের পিঠে রাখলো। ডাকলো, সঞ্জয়, ওঠ! সঞ্জয় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল, বেশ কয়েকবার ডাকেও সাড়া দিলো না।

আস্তে আস্তে চারজনেই বিছানা ছেড়ে উঠলো। মুখ ধোয়ার পর, দাড়ি কামিয়ে নিলো সবাই, অসীমের কাছে আফটার-শেভ লোশান এবং ক্রিম ছিল। প্রত্যেকের ব্যাগ থেকে ফরসা জামা-প্যান্ট বেরুলো, জুতোগুলো পর্যন্ত পালিশ করা হলো। রতিলাল তখনো আসে নি, সুতরাং এখানে চা খাওয়ার কোনো উপায় নেই। একেবারে বাড়িতে গিয়েই প্রথম চা খেতে হবে।

একটু বাদে যখন বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো ওরা চারজন, তখন ওরা সকলেই ছিমছাম পরিচ্ছন্ন যুবা, নিখুঁত পোশাক ও সুবিন্যস্ত চুল। জঙ্গল ছেড়ে ওরা বাইরে এলো।

পরমেশ্বর গেট খুলে দিলো ওদের দেখে, জয়ার শ্বশুর বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন— সবল চেহারার বৃদ্ধ, ধবধবে মাথার চুল ও গোঁফ, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো, এসো—। বৌমা, ছেলেরা এসে গেছে—।

জয়া ও অপর্ণা বেরিয়ে এলো পাশের একটি ঘর থেকে, এই সকালেই তাদের স্নান ও বেশবাস পাল্টানো হয়ে গেছে। ওরা ঘরে ঢোকা মাত্রই সাবান, স্নো, পাউডার, মাথার তেলের মিলিত কৃত্রিম সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। জয়া বললো, বাবা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এঁরা হচ্ছেন—।

সদাশিব ত্রিপাঠীর প্রশান্ত মুখে সামান্য দু'চারটি মাত্র অন্য রকম রেখা। দেখলে মনে হয়, এই মানুষ জীবনে সার্থক ও তৃপ্ত, সৎ এবং উদার। তবু মুখের রেখাগুলো পড়েছে জীবন যাপনের বৈচিত্র্যে। এখানে কাছাকাছি কোথায় ওঁর একটি কাঠের কারখানা আছে, তার পরিচালনার জন্য হয়তো ওঁকে কখনো কঠোর হতে হয়, সেই জন্য মুখে একটি রেখা, যৌবনে কোনো হটকারিতার জন্যও সম্ভবত মুখে আর একটা রেখা পড়েছে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যু বা আত্মহত্যার জন্যও কি মুখে আর একটি রেখা পড়ে নি? তবু তাঁর সমগ্র মুখে একটি সমগ্র ব্যক্তিত্ব; তিনি হেসে বললেন, এইসব স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখলে আমার, বেশ ভালো লাগে। এখানে তো বিশেষ কেউ আসে না—।

অসীমই প্রথম, বিনা ভূমিকায় ঝুপ করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। সুতরাং বাকি তিনজনকেও প্রণাম করতে হয়। জয়া বললো, আসুন, ব্রেকফাস্ট রেডি—

সদাশিব বললেন, তোমরা চা খেয়ে নাও। আমি কিন্তু আগেই সেরে নিয়েছি। আমার সকাল ছ'টার মধ্যেই চা খাওয়া হয়ে যায়।

বড় গোল টেবিল ছিমছাম সাজানো। এখানে পাঁউরুটি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু জয়া টেবিলের মাঝখানে টোস্টের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে, এমন কি টিনের সার্ডিন মাছ এবং ভালো জাতের মার্মালেডও উপস্থিত। প্রত্যেকের ডিশে দু'টি করে মুর্গীর ডিম। সবারই খিদে পেয়েছিল, খেতে শুরু করে শেখর বললো, জয়া, তোমার কালকে পাঠানো কাটলেট বেশ ভালো হয়েছিল। বেশ রাঁধতে শিখেছো তো!

জয়া হাসতে হাসতে বললো, আমি তো রাঁধি নি! ঠাকুর রেঁধেছে—একটু বেশি ঝাল হয়েছে, না?

— আমি একটু বেশিই ঝাল খাই।

— কাল সন্ধেবেলা আপনারা কি করলেন?

—কি আর করবো, জঙ্গলের মধ্যে একটু ঘুরলাম-টুরলাম, আর আড্ডা—সারাক্ষণ আড্ডা! ঐ জন্যই তো আসা! তোমরা কাল ঘাটশীলা থেকে কখন ফিরলে?

— বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার কপার মাইনসের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেনগুপ্তের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর বউ মহাশ্বেতা আমার মাসতুতো বোন—কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লো না।

অপর্ণা প্রত্যেকের কাপে কফি ঢেলে দিচ্ছিল, রবির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন কেন?

রবি অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললো, এই, মানে—

শেখর সঙ্গে সঙ্গে বললো, কাল রবি ফুল পাড়তে একটা গাছে উঠেছিল—

— গাছ থেকে পড়ে গেছেন নাকি?

— না, একেবারে ধপাস করে পড়ে গেলে কি আর হাড়গোড় আস্ত থাকতো! নামবার সময় শেষ দিকটায় পা পিছলে—

রবি বললো, একটা ছোট ডাল ধরেছিলুম, সেই ডালটা ভর্তি কাঠপিঁপড়ে—

অপর্ণা অন্যদের কাপে কফি ঢালা শেষ করলো, তারপর নিজের চেয়ারে বসে এক চুমুক দিয়ে বেশ স্পষ্ট গলায় বললো, মিথ্যে কথা মোটেই গাছ থেকে পড়ে যান নি।

এমনই অপর্ণার বলার ভঙ্গি, প্রত্যেকে ওরা চমকে উঠলো। একটা অজানা অস্বস্তি এক মুহূর্তে ওদের মুখে খেলা করে গেল। একটু লম্বা ধরনের মসৃণ মুখ অপর্ণার, সে মুখে এ পর্যন্ত একটিও রেখা পড়ে নি, বড় বড় দু'টি টানা চোখের মণি দুটো সদা চঞ্চল, ভিজে চুল আলগা বেণি করে ফেলে রেখেছে বুকের ওপর, বাঁ হাতের কনুই টেবিলে রাখা, মণিবন্ধে ঘড়ি ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই, একুশ বছরের যুবতী সুলভ কোনো অকারণ লজ্জাও নেই তার, অপর্ণার চাহনি ঝর্নার জলের মতন স্বচ্ছ।

শেখর হাসার চেষ্টা করে বললো, কেন, মিথ্যে কথা কেন?

অপর্ণাও হাসলো, বললো, আমি জানি।

— কি করে জানলে?

— আমি মিথ্যে কথা শুনেই বুঝতে পারি। মিথ্যে কথা বলার সময় মানুষের মুখ-চোখ কি রকম বদলে যায়!

জয়া বললো, সত্যিই কিন্তু রুণি ভীষণ বুঝতে পারে।

অসীম বললো, যাঃ, তা হতেই পারে না। আমি এমন মিথ্যেবাদী দেখেছি, সারা পৃথিবী তাদের কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য।

অপর্ণা বললো, আনবেন একবার তাদের আমার সামনে!

— ইস্, খুব গর্ব যে দেখছি। আর নিজের বুঝি সব সময় সত্যি কথা বলা হয়!

— আমি তা তো বলি নি! আমি তো বলি নি, মিথ্যা কথা বলা খারাপ। আমি বলেছি, আমি মিথ্যে কথা শুনলেই বুঝতে পারি।

জয়া বললো, রুণি মাঝে মাঝে লোককে এমন অপ্রস্তুত করে দেয়! সেদিন আমাদের সরকার মশাই বাবাকে বলছেন—

রবির মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে যেন এতক্ষণ কী একটা খুঁজছিল, জয়ার মুখে রুণি নামটা সে যেন খুঁজে পেলো। এতক্ষণ কেউই অপর্ণাকে তুমি কিংবা আপনি বলে নি, ভাববাচ্যে কাজ সারছিল, এবার রবিই অপ্রত্যাশিতভাবে অপর্ণাকে ডাক নামে ডেকে উঠলো। বললো, তুমি আমারটা কিন্তু ঠিকই ধরেছো, রুণি। আমি সত্যি গাছ থেকে পড়ে যাই নি। কিন্তু কেন পড়ে গিয়েছিলুম, তা অবশ্য বলবো না! তুমি তো মিথ্যেটা ধরতে পারো, কিন্তু সত্যিটা আসলে কি তা বুঝতে পারো?

— অনেক সময় তাও পারি।

— এটা কিছুতেই পারবে না।

জয়া আর অপর্ণা পরস্পর চোখাচোখি করে মেয়েদের অন্তর্জগতের ভাষায় হেসে উঠলো। অপর্ণা বললো, দেখলি দিদি, কায়দাটা কি রকম খেটে গেল!

জয়া বললো, আমিও কী রকম তোকে সাহায্য করলুম বল!

অপর্ণা বললো, আহা, তা না করলেও—

এরা দু'বোন যেন কী একটা রহস্য করছে আঁচ পেয়ে অসীম বললো, আমরা কিন্তু রুণিকে খুশি করার জন্যই স্বীকার করছি যে, আমরা মিথ্যে কথা বলেছি।

অপর্ণা ঝরঝর করে হেসে উঠে বললো, থাক, আর বলতে হবে না। গাছে উঠে ফুল পাড়তে গিয়েছিলেন! অতই যদি ফুল ভালবাসেন, তবে আজ আসবার সময় কিছু ফুল আনতে পারেন নি!

— বাঃ, তোমাদের বাগানেই তো কত ফুল রয়েছে, সেই জন্যেই আমরা বাইরে থেকে আর ফুল আনি নি।

— আহা, কি বুদ্ধি! বাগানে ফুল থাকা আর বাইরে থেকে কারুর উপহার আনা বুঝি এক কথা?

— ইস্! সত্যিই এটা ভুল হয়ে গেছে!

— তা বলে বোকার মত কাল যেন ফুল নিয়ে আসবেন না!

শেখর বলে উঠলো, তাহলে কালও আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন তো! যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

এবার মেয়েদের দমন করে পুরুষদের হাসির আওয়াজ দীর্ঘ।

চায়ের পাট শেষ হলে সদাশিব ঘুরে ঘুরে সারা বাড়িটা ওদের দেখালেন। সদাশিবের কোনো পূর্বপুরুষ এখানকার রাজাদের কুলপুরোহিত ছিলেন—সেই আমলের কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। সেই পুরোহিত বংশ এখন ধনী ও অভিজাত হয়েছে, সেই জন্যই বোধহয় ঐশ্বর্যের অহমিকার কোনো প্রকাশ নেই। দোতলার ঘরগুলো বনেদী চালে সাজানো। প্রত্যেক ঘরে পুরু গালিচা পাতা, দেয়ালে দেয়ালে অয়েল পেইন্টিং, এক ঘরে কিছু তলোয়ার, বর্শা, তীর আর গাদা বন্দুকের সংগ্রহও রয়েছে! এর অনেকগুলোই সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্যবহার হয়েছিল। ইতিহাস ও পুরাণ সদাশিবের বেশ ভালো পড়া আছে—তিনি ওদের বুঝিয়ে বলছিলেন, সঞ্জয় একাই প্রশ্ন করছিল শুধু।

তবে ওরা লক্ষ করলো, সদাশিব কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান, বাক্য শেষ না করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে একদিন আর একটি যুবার পায়ের শব্দ শোনা যেতো। বিলেতের কোন অন্ধকার ঘরে এক বরফ-পড়া রাতে অপমানিত অরুচিকর মৃত্যু তাকে নিয়ে গেছে।

সদাশিব নিজের ছেলের কথা একবারও তুললেন না। ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধের মতন একবারও নিজের ভাগ্যকে দোষ দিলেন না! কঠোর সহ্যশক্তির চিহ্ন তাঁর চোখে-মুখে। দুই মেয়ের পর ঐ একটি মাত্র ছেলে ছিল তাঁর রূপবান, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান ছেলে। পার্থিব কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার, নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল জয়াকে, ফুটফুটে সন্তানের পিতা হয়েছিল—তবু কেন সব ছেড়ে সে দূর লন্ডনের এক ভ্যাপসা গন্ধমাখা ঘরে একা একা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর কাছে চলে গেল—এই একটা বিরাট প্রশ্ন এ বাড়ির নিস্তব্ধতার মধ্যে মিশে আছে।

খানিকক্ষণ ওরা হৈ-হৈ করে সামনের বাগানে ব্যাডমিন্টন খেললো। রবির হাতে র‍্যাকেট

ঘোরে তলোয়ারের মতন, অপর্ণাও মন্দ খেলে না। চটি খুলে রেখে খালি পায়ে ছুটছে অপর্ণা, এক একটা পয়েন্ট নিয়ে রবিকে বলছে, জানি, আপনি বলবেন, আপনার পা খোঁড়া বলে আজ খেলতে পারছেন না! আপনাকে হারিয়ে আনন্দ নেই।

রবি বললো, দেখো–না, এক পায়েই কী রকম খেলি! সঞ্জয়, তুই পেছন দিকটা সামলে রাখ।

— অসীমদা, আপনি অত চাপ মারবেন না, প্লেসিং করুন।

পরমেশ্বর জয়ার ছেলে দেবকুমারকে বেড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলো। শেখর তাকে নিয়ে আদর করলো, তার সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়ে খেললো খানিকক্ষণ। দু'গেম খেলেই জয়া হাঁপিয়ে উঠেছিল, সে এসে পাথরের বেদিতে বসলো। শেখর বললো, জয়া, আজ তো হাট হবে। আজ হাটে যাবে নাকি?

জয়া বললো, হ্যাঁ, রুণি বলেছে কাচের চুড়ি কিনবে।

— আমরাও যাবো ওখানে তা হলে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।

— ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো। নইলে বড় একঘেয়ে লাগছিল। রুণি তো হাঁপিয়ে উঠেছে এরই মধ্যে।

— তোমরা আর কতদিন থাকবে?

— বাবা আরও দিন পনেরো থাকতে চান। রুণিরও তো এখন ছুটি। আপনাদের কেমন লাগছে এ জায়গাটা?

— আমার তো বেশ ভালোই লাগছে। তোমরা আমাদের বাংলোয় চলো না—সবাই মিলে পিকনিক করা যাবে।

— খুব ভালো কথাই তো! কবে বলুন?

— আজ?

— আজ থাক। আজ হাটে যেতে হবে যখন—সকাল সকাল খাওয়া–দাওয়া সেরে নেওয়াই ভালো। আপনারাই বরং দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে নিন না!

শেখর একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। অপর্ণা–রবিদের খেলার দিকে দেখলো একবার। তারপর কি যেন ভেবে জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, না আজ খাবো না। নেমন্তন্ন করো নি! এমনি খাবো কেন! তোমার বিয়েতেও তুমি আমায় নেমন্তন্ন করো নি!

জয়া বললো, আপনি অনেক বদলে গেছেন!

শেখর জয়ার বাহুতে একটা টোকা মেরে বললো, তুমি বদলাও নি? তুমিও অনেক বদলে গেছ।

ফেরার সময় মাঝপথে এসে অসীম পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে বললো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত হবে না, বুঝলি! আগে থেকেই ঠিক করা ভালো—কে কার দিকে মনোযোগ দেবে? সঞ্জয় তো গম্ভীর হয়েই আছে ও বাদ। আর শেখর তো জয়ার সঙ্গেই—জানা কথা। রবি, তোর আর আমার মধ্যে কে অপর্ণাকে চান্স নেবে—আগে থেকে ঠিক হয়ে যাক।

শেখর হাসতে হাসতে বললো, ওরকমভাবে হয় নাকি? মেয়েটার কাকে ভালো লাগবে—কিংবা কারুকেই ভালো লাগবে কিনা—সেটা দ্যাখ!

— সে আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেবো! অসীম টুসকি দিয়ে আধুলিটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে মুঠোয় লুফে নিয়ে বললো, বল রবি, হেড না টেল। এই আধুলিটা হচ্ছে অপর্ণা।

রবি অভাবিত রকমের নিস্পৃহ গলায় বললো, আমার দরকার নেই। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

— সে কি, তুই যে সব সময় ওর দিকেই মনোযোগ রেখেছিলি।

— সে এমনি খেলার খেলা। যেটুকু সময় দেখা, তাছাড়া আর—

— তোর বুঝি আবার মনে পড়েছে—

রবি হাত তুলে নীরস গলায় বললো, থাক। এখন ওকথা থাক।

সবাই এক মুহূর্ত চুপ করে গেল। অসীমের হাত তখনো মুঠো করা, মুঠোয় বন্দী আধুলি। শেখর বললো, আচ্ছা অসীম, আমিই কনটেস্টে নামছি। তুই হেড আমি টেল, এবার হাত খোল, দেখি অপর্ণা কার ভাগ্যে উঠেছে।

অসীম মুঠোর মধ্যে রেখেই আধুলিটা পকেটে ভরে বললো, তা হলে থাক, ব্যাপারটা রহস্যেই থেকে যাক।

— খুললে দেখবি, তোর ভাগ্যে ওঠে নি। ওখানে কিছু সুবিধে হবে না—ও বড় কঠিন মেয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

— আমিও কম কঠিন ছেলে নই। কঠিনে কঠিনে বেশ টক্কর খাবে। কথাটা বলে অসীম আড়চোখে রবির দিকে তাকালো। একটানা এতক্ষণ খেলার পর রবির মুখটা ঘামে ভেজা-ভেজা, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। জামার সব ক'টা বোতাম খুলে দিয়েছে রবি, কারুর কথায় কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না। অসীম রবিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, কি রে, তুই চান্স নিবি না বলছিস, আর ওদিকে তো বেশ রুণির হাতখানা খপ করে ধরে ফেললি একবার!

রবি এবার ম্লানভাবে হেসে বললো, ওটা অভ্যেস!

— তার মানে!

— মানে আর কি। হাতের কাছে কোনো মেয়ের হাত দেখলেই ধরতে ইচ্ছে করে। সুন্দর শরীর দেখলেই ইচ্ছে করে একটু আদর করতে। এইসব পুরোনো অভ্যেসগুলো কিছুতেই কাটাতে পারছি না। কিন্তু মেয়েদের আর আব্দার একেবারে সহ্য হয় না।

—মেয়েদের সহ্য হয় না তোর? মাইরি, বেশ লাগলো শুনতে কথাটা!

সন্ন্যাসী হবি নাকি? সন্ন্যাসী কেন হবো? কিন্তু ঐ সব স্নো-পাউডার মাথা ন্যাকা মেয়েদের আমি দু'চক্ষে সইতে পারি না!

— রুণি তুই ন্যাকা বলছিস!

— নিশ্চয়ই ন্যাকা। ওরা সবাই একরকম!

— বাজে বকবক করিস না! তুই নিজেই একটা ন্যাকা হচ্ছিস দিন দিন!

রবি এবার পরিপূর্ণভাবে হেসে বললো, কি রে, রুণির নাম তোর এত গায়ে লাগছে কেন? আমি তো বললুমই তোকে চান্স নিতে।

অসীম গজগজ করে তবু বলে, তপতীর ব্যাপারের পর তুই গোটা মেয়ে জাতটার ওপরে খেপে গেছিস। কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, তপতীর শুধু একারই দোষ ছিল না, তোরও দোষ ছিল—

রবি হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠলো, ঝাঁঝাল গলায় বললো, দ্যাখ অসীম, তোদের কারুর মুখ থেকে আমি তপতীর নাম উচ্চারণও শুনতে চাই না, বুঝলি? আর কক্ষনো বলিস না।

—কেন বলবো না? বেশ করবো!

শেখর মাঝখানে এসে বললো, আঃ, অসীম, থাক না। চুপ কর।

৭

হাট দেখে নিরাশই হলো। গুচ্ছের মাটির হাঁড়িকুড়ি আর তরিতরকারির দোকান ছাড়া কিছুই নেই প্রায়। কিছু মুর্গী ছাগল এসেছে, গামছা আর ঝ্যালঝেলে শাড়ি–ধুতির কয়েকখানা দোকান, এক কোণে কয়েকটা নাপিত লাইন দিয়ে চুল কাটতে বসেছে। আর একদিকে ভাত–পচাই হাঁড়িয়ার মদ বেচছে কয়েকটা মেয়ে, ছুরি–কাঁচি শান দিচ্ছে একটা লোক—তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। তবু মানুষের অন্ত নেই, দূর দূর গ্রাম থেকে সকাল থেকেই এসেছে মেয়ে–পুরুষ, খেতে না পাওয়া শীর্ণ চেহারার মিছিল।

ওরা ভেবেছিল, হাট হবে অনেকটা মেলার মতন, আনন্দ–ফূর্তি হৈ–হল্লার একটি বিকেল। তার বদলে শুধুই মানুষ আর বেগুন–পটলের ভিড়, এরা সবাই এসেছে অজানা অঞ্চলের মাঠ, জঙ্গল কিংবা টিলার প্রান্ত থেকে, শুধু হৃদয়হীন বিনিময়ের জন্য। বেঁচে থাকা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মতন একটা দারুণ শক্ত কাজে এরা সবাই বিষম ব্যস্ত।

আনন্দের ব্যবস্থা যে একেবারেই নেই তা নয়, ডুগডুগিতে ডিগ—ডিগ—ডিগ—ডিগ শব্দ তুলে বাঁদর নাচ দেখানো হচ্ছে এক জায়গায়, ছক্কা–পাঞ্জার জুয়ার বোর্ড পড়েছে গোটা তিনেক, হাঁড়িয়ার দোকানগুলোতেও ভিড় কম নয়।

রোদের তাপ উঠেছে চড়া হয়ে, ওরা চারজন অলস পায়ে ঘুরছে, ভালো লাগছে না ওদের, সঞ্জয় বললো, চল, কাল চলে যাই এ জায়গা থেকে। আর ভালো লাগছে না।

অসীম বললো, কেন, খারাপ কিসের—কলকাতাতেই বা এর চেয়ে কী এমন বেশি ভালো লাগে!

— কিন্তু আমরা এখানে এসেছিলুম চুপচাপ থাকতে। কিন্তু এখানেও সেই ভিড় আর গণ্ডগোল!

— তোর যদি ভিড় ভালো না লাগে তো তুই বাংলোয় গিয়ে শুয়ে থাক না!

সঞ্জয় বললো, ঠিক ভিড়ের জন্যও না। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। আদিবাসীদের মেলা অনেক কালারফুল হবে ভেবেছিলাম। কতগুলো কুষ্ঠরোগী এসেছে দ্যাখ। ওদের দিকে তাকালেই গা শিরশির করে।

শেখর বললো, তুই সব কিছুই দেখবি কেন? তোর পছন্দমতন বেছে নে! লক্ষ করে দ্যাখ, এখানকার পুরুষগুলো সব রোগাপটকা হলেও মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য খারাপ নয়, তাকাতে খারাপ লাগে না। আমি শুধু মেয়েদেরই দেখছি!

সঞ্জয় শেখরের ইয়ার্কি গায়ে মাখলো না। বললো, একটা জিনিস তোর মনে হচ্ছে না। এদের মধ্যে আমরা যেন একেবারে বিদেশি। আমাদের পোশাক, চালচলন—এদের সঙ্গে কত তফাৎ—আমরা একই দেশের মানুষ, এ কথা বোঝার কোনো উপায় আছে? এদেশে রেভোলিউশান কবে সম্ভব হবে? আমাদের কথা ওরা কোনোদিন শুনবে? কোনোদিন ওরা আমাদের বিশ্বাস করবে? আপন জন বলে ভাববে?

শেখর বললো, তুই একটা মধ্যবিত্ত, তোর কথা কে শুনবে? কেউ শুনবে না। বিপ্লব যদি কখনো হয় তবে তার নেতা ওদের মধ্যে থেকেই জন্মাবে।

— কবে?

ভিড়ের মধ্যে লখাকে দেখতে পেয়ে শেখর ওকে ডেকে উঠলো। লখার সঙ্গে স্পষ্ট চোখাচোখি হতেও লখা সাড়া দিলো না, চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অসীম হাসতে হাসতে বললো,

ওর অভিমান হয়েছে। আসবে আবার ঠিক, কলকাতায় চাকরি দেবার লোভ দেখিয়েছি।

পরমেশ্বরের সঙ্গে অপর্ণা আর জয়াও এসেছে। ওরা চারজন তখন জুয়ার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, অসীম শেখরকে বলছিল, কি রে, খেলবি নাকি?

শেখর বলছিল, কী হবে খেলে, গরিব বেচারারার এক্ষুনি আমাদের কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে! এ খেলায় যার বেশি টাকা থাকে সেই জেতে, আমি কতবার দেখেছি! এদের সঙ্গে খেলতে ভালো লাগে না—

অসীম বললো, যা, যা, চাল মারিস না! তুই সব খেলাতেই জিতিস? খেলে দ্যাখ না?

শেখর হেসে পকেট থেকে ব্যাগ বার করলো! ফিস ফিস করে বললো, অসীম তুই আমার জুয়া খেলা দেখিস নি। সুনীল আর অবিনাশের সঙ্গে বারীণদার আড্ডায় এক সময় কি তুলকালাম কাণ্ড করেছি, তুই তা জানিস না।

একটা লাল দু'টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে শেখর বললো, ছড়িদার, রাখো ওটা হরতনের ওপর রাখো।

যে লোকটা বোর্ড পেতেছে, সে সম্ভ্রমের সুরে বললো, পুরা দু'রুপিয়া, মালিক? এখানে সিকি–আধুলির বেশি কেউ খেলে না, সামর্থ্য নেই। শেখর ঘাড় হেলালো। টিনের কৌটোর মধ্যে একটা বড় ছক্কা ঘটাং ঘটাং করে নেড়ে ওলটালো লোকটা। রুহিতন। শেখর হেরেছে। শেখরের মুখে কিন্তু তখনো টেপা হাসি। এবার একটা পাঁচ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে বললো, ফিন্ হরতন।

সেবারেও শেখরের হার। শেখর একটা দশ টাকার নোট রাখলো সেই হরতনেই। আবার হার। আবার হরতনে কুড়ি টাকা। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে শেখরকে দেখছে। সেবার হরতন উঠলো, শেখর বললো দাও হে ছড়িদার, ষাট টাকা দাও! দেখলি অসীম এ খেলাটা এতই সোজা।

সঞ্জয় বললো, থাক শেখর, টাকাটা তুই নিস নি। বেচারা গরিব লোক।

শেখর বললো, অত দয়ামায়া আমার নেই। জুয়ার টাকা আমি ছাড়ি না।

এমন সময় পেছন থেকে জয়া বলেছিল, একি, কতক্ষণ থেকে আপনাদের খুঁজছি !

ওরা পেছন ফিরে বললো, আমরাও তো তোমাদের খুঁজছি। রুণি, তোমার কাচের চুড়ি কেনা হয়েছে? হয় নি? চলো খুঁজে দেখি।

— আপনাদের আরেকজন কই?

ওরা তাকিয়ে দেখলো, রবি নেই। একটু আগেও ছিল। অসীম বললো, কিছু একটা কিনছে বোধহয়। এসে পড়বে এক্ষুনি!

অপর্ণা বললো, আমরা তো সব জায়গাই ঘুরে এলুম, ওকে কোথাও দেখলুম না তো!

— একটু আগেও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। কিছু বলে যায় নি যখন, তখন কাছেই কোথাও গেছে। হয়তো—

— আপনারা ঐ ভিড়ের মধ্যে কি করছিলেন?

— জুয়া খেলছিলাম। শেখর অনেক টাকা জিতে নিয়েছে!

জুয়ার কথা শুনে জয়া একটু আঁৎকে উঠলো। ভর্ৎসনার চোখে শেখরকে দেখে বললো, ছি ছি, ঐসব লোকের মধ্যে বসে আপনারা জুয়া খেলছিলেন?

শেখর হাসতে হাসতে বললো, তাতে কী হয়েছে? জিততে বেশ লাগে। তুমি একটু খেলবে নাকি?

— মাগো। বলতে লজ্জা করলো না আপনার? হাটের মধ্যে বসে আমি জুয়া খেলবো— আর বাকি থাকবে কি?

অপর্ণা কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ পেয়ে গেল। উজ্জ্বলভাবে দাবি জানালো, আমি খেলবো একটু!

আমায় খেলাটা শিখিয়ে দিন। কত টাকা লাগবে?

দু'বোনের বদলে অপর্ণা আর জয়াকে দুই বন্ধু বলেই মনে হয় সব সময়। তার মধ্যে অপর্ণারই ব্যক্তিত্ব বেশি। এবার কিন্তু জয়া হঠাৎ দিদিগিরি ফলিয়ে ভারী গলায় বললো, না, রুণি, ছেলেমানুষী করিস না!

— কেন, একটু খেলি, বেশি না।

— না। বাবা শুনলে রাগ করবেন।

দিদির কথার অবাধ্য হবে কি হবে না—এই রকম দ্বিধা অপর্ণার মুখে। সে আর কিছু বলার আগেই শেখর তার চোখে সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে বললো, রুণির খুব শখ দেখছি। এই বয়েসেই জুয়া খেলায় এত ঝোঁক? থাক, খেলতে হবে না, চলো।

পায়ে পায়ে সম্পূর্ণ হাটটাই ঘোরা হয়ে যায় আবার। সঞ্জয় বার বার চোরা চাহনিতে দেখছে অপর্ণাকে। অনুরাধার সঙ্গে অপর্ণার সত্যিই দারুণ মিল। শুধু চেহারায় নয়, স্বভাবেও। অনুরাধা যদি এই মেলায় আসতো—তাহলে সেও নিশ্চয়ই জুয়া খেলতে চাইতো। হঠাৎ একটা কথা কল্পনা করে সঞ্জয়ের হাসি পেলো। মিঃ বিশ্বাস যদি কখনো দেখতে পেতেন, এই রকম একটা হাটে কতগুলো নোংরা আর জংলী লোকের সঙ্গে বসে তাঁর মেয়ে জুয়া খেলতে চাইছে—তাহলে তাঁর মুখের চেহারা কেমন হতো? মিঃ বিশ্বাস খুব স্পোর্টের ভক্ত, জুয়া খেলাকেও তিনি কি স্পোর্ট হিসেবে নিতে পারতেন? কিংবা গেইম ফর রিলাক্সেশান? মিঃ বিশ্বাসের ওপর কোনো একটা প্রতিশোধ নেবার দারুণ ইচ্ছে হয় সঞ্জয়ের।

অসীম বার বার চেষ্টা করছে অপর্ণার পাশে পাশে হাঁটতে। অপর্ণা কখনো এদিক-ওদিক চলে গেলে অসীম আবার স্থান বদলে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে। অপর্ণার কৌতূহলের শেষ নেই। যে-কোনো ভিড় দেখলেই সে একবার উঁকি দেবে। এমনকি বাঁদর নাচও তার দাঁড়িয়ে দেখা চাই।

অনেক খুঁজে একটা পছন্দসই চুড়ির দোকান পাওয়া গেল। অন্যদের সরিয়ে ওরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জয়ার হাত নরম—সহজেই সে হাতভর্তি চুড়ি পরে ফেললো, কিন্তু অপর্ণার হাত একটু শক্ত, অনভিজ্ঞ চুড়িওয়ালা অনবরত পরাতে গিয়ে ভাঙছে। অসীম তার পাশে বসে পড়ে বললো, ধ্যাৎ, দাও, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

অপর্ণা ভ্রূভঙ্গি করে বললো, আপনি চুড়ি পরাতেও পারেন বুঝি?

— পরাতে না পারি, ওর মত ভাঙতে তো পারবো। ভাঙছেই যখন, ওর বদলে আমিই ভাঙি।

— কিন্তু ও ভাঙলে পয়সা লাগবে না, আপনি ভাঙলে পয়সা দিতে হবে।

— হোক। তবু আমার কাচের চুড়ি ভাঙতে ভালো লাগে।

— আগে অনেক ভেঙেছেন বুঝি?

— হ্যাঁ, অনেক। মনে মনে।

অসীম অপর্ণার হাত নিজের করতলে তুলে নিলো, আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, নখগুলোতে গোলাপি আভা, দেখতে এত নরম হাত—এত শক্ত কেন?

— মুখ-টেপা হাসিতে অপর্ণা বললো, একি অত জোরে চেপে ধরেছেন কেন? চুড়ির বদলে আমার হাতটাই ভাঙবেন দেখছি!

অনেক ভেবে-চিন্তে সঞ্জয় একটা রসিকতা করার চেষ্টা করলো, কি করবে, ওর তো পাণিগ্রহণ করার অভ্যেস নেই!

সে রসিকতায় কেউ হাসলো না। জয়া বললো, চুড়িওয়ালা হিসেবে অসীমবাবুকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে!

অসীম বললো, রুণি, তুমি কী রঙের চুড়ি পরবে বলো?

— আপনিই পছন্দ করুন।

অপর্ণার শাড়ির পাড় হালকা সবুজ, কপালেও সবুজ টিপ পরেছে, সেগুলো এক পলক দেখে নিয়ে অসীম বললো, তোমাকে সবুজই ভালো মানাবে—সবুজ চুড়ির গোছা তুলে নিয়ে, সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে অসীম প্রথম দুটো চুড়ি না ভেঙে অপর্ণার হাতে পরিয়ে দিলো।

পেছনে দাঁড়ানো উদ্‌গ্রীব জয়া, শেখর, সঞ্জয় হু-র্‌-রে করে উঠলো। অসীম সগর্বে পরের দু'গাছা একটু তাড়াতাড়ি পরাতে দু'গাছা কব্জি পর্যন্ত এসেও টিকলো না, অপর্ণা বললো, আপনি আমার হাত কত জোরে চেপে ধরেছেন! লাগছে, সত্যি!

শেখর বললো, অসীম, উঠে আয়, তোর কেরদানি বোঝা গেছে। তুই ভাঙতে ভাঙতে দোকানই সাফ করে ফেলবি।

অসীম বেপরোয়াভাবে জবাব দিলো, ভাঙুক না। ক'টাকার আর জিনিস আছে এখানে!

অসীমের এই স্থূল ভাষণে সঞ্জয় একটু দুঃখিত বোধ করলো চুড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে সে যেন একবার নীরবে ক্ষমা চেয়ে নিলো। সঞ্জয় অনুভব করলো, কি করে যেন তার মনের বিষণ্নতা বা গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। অনুরাধাকে সে কোনোদিন কাচের চুড়ি পরতে দেখে নি। অনুরাধার হাত কি শক্ত? কোনো সন্দেহ নেই, এই হাটে এলে অনুরাধারও কাচের চুড়ি পরতে বসে যেতো!

অপর্ণা মুখ তুলে বললো, হাতখানা কি রকম জোরে ধরেছে দেখুন না! চুড়ি পরাবেন না হাতকড়ি পরাবেন?

—দাঁড়াও, এবার ঠিক, খুব আস্তে—হাতখানা আস্তে ধরে অসীম বোধহয় চুড়িগুলো বেশি জোরে ধরেছিল, এবারে একটা চুড়ি ভেঙে অপর্ণার হাতের মধ্যে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে বেরিয়ে এলো রক্ত, অপর্ণার ফরসা হাতের ওপরে মোটা মোটা রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে গেল। একটুও মুখ বিকৃত না করে, অপর্ণা খলখল করে হেসে উঠে বললো, বেশ হয়েছে, এবার ছাড়ুন!

অসীমের মুখ ফ্যাকাশে, বললো, ইস্! রক্ত বেরিয়ে গেল!

সে তখনো অপর্ণার হাত ধরে রক্তের দিকে চেয়ে আছে, অপর্ণা আবার বললো, এবার হাতখানা ছাড়ুন।

—রক্ত! কী হবে এখন!

—কী আর হবে! ভারী তো একটু রক্ত।

জয়া বললো, রুণি, উঠে আয় হাতটা বেঁধে দিচ্ছি—

অপর্ণা বললো, বাঁধতে হবে না, এক্ষুনি থেমে যাবে, বেশি কাটে নি।

অসীমের মুখখানা ক্রমশ অস্বাভাবিক সাদা হয়ে এলো, গলার আওয়াজ বদলে গেছে, সে বললো, আমি রক্ত বার করে দিলাম!

অপর্ণা সেই রকমই হাসতে হাসতে বললো, ও কি, আপনি ওরকম করছেন কেন? একটু রক্ত বেরিয়েছে তো কি হয়েছে?

—মুখ দিয়ে টানলে অনেক সময় রক্ত থেমে যায়।

অবলীলাক্রমে অপর্ণা তার হাতখানা অসীমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনি মুখ দিয়ে টানবেন? টানুন না।

অসীম কেঁপে উঠে বললো, না না, আমি রক্ত সইতে পারি না—

না, না।

—কী ছেলেমানুষ! ভয় পান বুঝি?

কাল সন্ধেবেলা মহুয়ার দোকানে সেই নাচুনে মেয়েটার দিকে অসীম যে-রকম ভয়ার্তভাবে তাকিয়েছিল, আজও অসীমের দৃষ্টি ক্রমশ সেই রকম হয়ে এলো। শেখর বুঝতে পারলো অসীমের সেই পরিবর্তন। শিরা ফুটো হয়ে গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।—কিন্তু অপর্ণার হাতের ঐটুকু ক্ষত থেকে বেশ রক্ত বেরুতে লাগলো! কয়েক ফোঁটা পড়লো মাটিতে। অপর্ণার হাত ছেড়ে দিয়ে অসীম সেই মাটিতে পড়া রক্তের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শেখর বললো, দেখি রুণি, তোমার হাতে কাচ-টাচ ফুটে আছে কি না। গাঁদা গাছের পাতা রগড়ে লাগালে রক্ত এক্ষুনি থেমে যেতো। অপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে, শেখর সস্নেহে তার হাতখানা নিয়ে পকেট থেকে ফরসা রুমাল বার করে মুছতে লাগলো। কাচ বিঁধে নেই, কিন্তু ক্ষতটা ভোঁতা ধরনের, তাই রক্ত থামতে চাইছে না।

এর মধ্যেই ওদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। বাবুদের বাড়ির সুন্দরী মেয়ের হাতে রক্ত, আর একজন ছোকরাবাবু এত মানুষের ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়ের হাত ধরে আছে। হাটের জীবনে আর তো কোনো মজা নেই, এই একটুখানি মজা! তাদের আরও আনন্দ দেবার জন্যই বোধহয় শেখর অপর্ণার হাতটা মুখের কাছে নিয়ে ক্ষতস্থানে মুখ দিলো।

অপর্ণার মুখে কোনো রেখা নেই, সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, রবিদা তো এলেন না!

জয়া শিউরে উঠে বললো, ইস্, অন্য কারুর রক্তও কেউ খেতে পারে! শেখরবাবু যেন একটা কি।

শেখর হাসিমুখ তুলে বললো, আমি নিজের হাত কেটে গেলে কখনো মুখ দিতে পারি না। কিন্তু মেয়েদের রক্তের স্বাদ নেবার সুযোগ তো আর কখনো পাই নি! তাই একটু চেয়ে নিলাম। রুণির রক্ত কি মিষ্টি!

অপর্ণা এই প্রথম নিজের ক্ষতস্থানে ভালো করে তাকালো। আপন মনে বললো, মিষ্টি বুঝি! আমি শুনেছিলাম সব রক্তের স্বাদই নোনতা। রবিদা'র কি হলো? হারিয়ে গেলেন নাকি?

—কী জানি, হয়তো আমাদের খুঁজে না পেয়ে বাংলোয় ফিরে গেছে।

—চলুন, এবার আমরাও ফিরি, এ হাটের তো কিছুই দেখার নেই। তা ছাড়া এমন জলতেষ্টা পেয়েছে। ইস্, কতদিন যে কোকাকোলা খাই নি!

শেখর বললো, সত্যিই তো, কোকাকোলার অভাবে বালিগঞ্জের মেয়েদের তো কষ্ট হবেই! ডাব খাবে?

—ডাব পাওয়া যাবে এখানে?

—না, খোঁজাখুঁজি করেও ডাব পাওয়া গেল না। পানীয় বলতে এখানে শুধু হাঁড়িয়ার মদ। তা দিয়ে অপর্ণার তৃষ্ণা মেটানো যাবে না। এবার ফিরতেই হবে।

হাট ভাঙতে শুরু করেছে বিকেল গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই! খুব বেশি রাত হবার আগেই এরা অনেকে ফিরে যাবে দূর দূর গাঁয়ে। মাটির হাঁড়িতে সওদা ভরে নিয়ে দল বেঁধে চলে যাচ্ছে অনেকে। নতুন করে আসছেও দু'একটা দল। কিন্তু এ কথা ঠিক, রবি এদের মধ্যে কোথাও নেই। শেখরের ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল। ওদের ডেকে বললো, চলো, এবার ফিরি।

অসীম একটু দূরে সরে গিয়েছিল, আবার অপর্ণার পাশে এসে বিষণ্ন সুরে বললো, তোমরা আমাদের বাংলোয় একটু বসবে? ওখানে ডেটল আছে, লাগিয়ে দিতাম—ইস, এতখানি রক্ত বার করে দিলাম।

অপর্ণা পাগলাটে গলায় বললো, খবরদার, আর রক্তের কথা বলবেন না। আমার ভালো লাগছে না! আপনি ওরকম করছেন কেন?

শেখর জয়াকে জিজ্ঞেস করলো, কি, একটু বাংলোয় গিয়ে বসবে নাকি? তোমার শ্বশুরমশাই

চিন্তা করবেন না তো?

জয়া উত্তর দিলো, পরমেশ্বরকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারি। কিন্তু ছেলেটা আবার কান্নাকাটি না করে। চলুন, একটু ঘুরে আসি, আমি ঐ বাংলোতে কখনো যাই নি।

বাইরে গাছতলায় বসেছিল পরমেশ্বর। জয়া তাকে ডেকে বললো, তুমি বাবুকে গিয়ে বলবে, আমি একটু পরে আসছি। ছোটবাবু যদি কাঁদে—আমার কাছে আসতে চায়—তবে আমার কাছে ঐ বাংলোয় যাবে। বুঝলে?

৮

বাংলোতে বেশ ভিড়। চৌকিদার রতিলাল খাকি পোশাক পরে সেজেগুজে ফিটফাট হয়েছে, আর কয়েকজন ফরেস্টগার্ড ঘোরাঘুরি করছে। বাইরের বাগানে চেয়ার-টেবিল সাজানো, ফুলদানিতে ভর্তি ফুল। কি ব্যাপার? আজ এখানে উৎসব নাকি?

রান্নাঘরের পাশ থেকে চওড়া মুখে বিনীত হাস্যে রেঞ্জার সুখেন্দু পুরকায়স্থ বেরিয়ে এসে বললো, আজ কনজারভেটর আসবেন, খবর পাঠিয়েছেন। প্রায় সাড়ে তিন মাস বাদে স্যার এদিকে আসছেন, না, না, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না

—সেই জন্যই বাইরে ব্যবস্থা করেছি, আপনারা বারান্দা কিংবা ঘরে বসুন—উনি অবশ্য আজ রাত্রে এখানে থাকবেন কি না ঠিক নেই—

অরণ্যের অধিপতি আসছেন, তাই সাজসাজ রব। ওদের একটু আড়ষ্ট লাগতে লাগলো, ওরা যেন আজ এখানে অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ওদের দিকে বিশেষ কেউ চেয়ে দেখছে না। জয়া বললো, তা হলে আজ আমরা চলে যাই—।

শেখর বললো, না, কেন—

অপর্ণার কব্জিতে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো হয়ে গেছে, সে বললো, বাঃ, যাবো কেন, বেশ সুন্দর লাগছে জায়গাটা—আসুক না ওরা।

জয়া তবু স্বস্তিবোধ করছে না। সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ সে, একটা জিনিস তার সহ্য হয় না—সে যেখানে উপস্থিত থাকবে, সেখানকার চাকর-আর্দালিরা তার হুকুমের প্রতীক্ষায় না থেকে অন্যদের জন্য খাটবে—এরকম তার অভ্যেস নেই। রতিলালকে দু'বার ডেকেও পাওয়া যায় নি। তার ওপর সে যখন শুনলো—শেখরদের ঠিক মতন রিজার্ভেসান নেই এখানে, তাতে সে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এক্ষুনি চলুন না আমাদের বাড়িতে। কত ঘর পড়ে রয়েছে—বাবা খুব খুশি হবেন।

সঞ্জয় তাকে বললো, না, বসুন না। সামান্য কে এক কনজারভেটর আসছে বলেই আমরা পালাবো কেন?

রবির অনুপস্থিতি এখন স্পষ্ট বোধ করা যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে রবিই দাপটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারতো। ওরা বারান্দায় বসে নিচুস্বরে গল্প করতে লাগলো।

একটু ঘুরে এসে সঞ্জয় বললো, জানিস শেখর, এখানে আশ্চর্য চলছে। কনজারভেটরদের গুষ্টির জন্য কি রান্না হয়েছে জানিস? রাক্ষসের খাবার! ডজন খানেক টোস্ট, গুচ্ছের চিংড়ি মাছ ভাজা, ভেটকি মাছ, এক হাঁড়ি রসগোল্লা, ক্ষীর—এসব যোগাড় করলোই বা কি করে? আর, কাদের পয়সায় জানিস?—বলতে বলতে সঞ্জয় উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আমি রতিলালকে জিজ্ঞেস করলুম, সব ঐ রতিলাল আর তিনজন ফরেস্ট-গার্ডের পয়সায়—সাতচল্লিশ টাকা করে মাত্র মাইনে পায়—কী ব্যাপার চলছে এসব এখানে?

অসীম বললো, এসব জঙ্গলের আলাদা নিয়ম-কানুন, তুই এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছিস কেন?

—তার মানে? চালাকি নাকি? কনজারভেটরও তো নেহাত একজন সরকারি অফিসার—তার খাওয়ার জন্য এরা খরচ করবে কেন?

—হয়তো সাহেব ওদের পরে বকশিশ দিয়ে দেবে।

—কোনো সরকারি অফিসার বেয়ারাদের বকশিশ দেয় না। আমি জানি না? আচ্ছা, দেখছি ব্যাপারটা।

কিন্তু রতিলালকে আমরা ডাকছি, সে আসছে না কেন? আমরা তো তাকে রোজই বকশিশ দিচ্ছি।

—আমি বলে এসেছি, আসছে এক্ষুনি। ওর দোষ নেই। রতিলাল লোকটা সত্যি ভালো—চোর-টোর নয়, সৎলোক। কিন্তু কি করবে? কনজারভেটর ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—আমরা তো এসেছি দু'দিনের জন্য। সুতরাং বড় সাহেবকে খুশি না করলে—

এই সময় রতিলাল আস্তে আস্তে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। মেয়েদের দিকে একবার আড়চোখে তাকালে। অসীম জিজ্ঞেস করলো, কী রতিলাল, আমাদের চা দেবে না? এতবার ডাকছি, শুনতে পাও নি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রতিলাল কাঁচুমাচুভাবে বললো, বড়াসাব ইধার আজ রাতমে ঠার জানে সে আপলোগ—

অসীম তীব্রভাবে বললো, সে আমরা বড় সাহেবের সঙ্গে বুঝবো। এই মেমসাহেবদের চেনো? ত্রিপাঠীজির কোঠি—দরকার হলে আমরা সেখানে চলে যাবো।

অপর্ণা বললো, আমার কিন্তু এক্ষুনি চা চাই। যা তেষ্টা পেয়েছে—

পর পর দুটো গাড়ি এসে কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নামলো দু'জন সমর্থ পুরুষ, একজন স্থূলাঙ্গী মহিলা, দুটো বাচ্চা, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে—চাপা প্যান্ট ও হাতে মাউথ অর্গান, একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে—আঁট শালওয়ার-কামিজ পরা—হাতে ট্রানজিস্টার, মুহূর্তে জায়গাটা মাউথ অর্গানের কর্কশ আওয়াজ আর হিন্দী গানের সুরে মুখরিত হলো। তা ছাপিয়ে শোনা গেল স্থূলাঙ্গী মহিলার কণ্ঠস্বর, লাস্ট টাইম ইধার একঠো ম্যাগনোলিয়া ট্রি দেখ কর গিয়া, উও কিধার—?

শেখররা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল, দলটি ওদের এখনো দেখতে পায় নি। সঞ্জয় বললো, ঐ পাইপ মুখে লোকটাই টপ বস্, মুখ দেখলে চেনা যায়। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে, সুতরাং এটা অফিশিয়াল ট্যুর নয়। ওর কোনো প্রায়রিটি নেই। গাড়িগুলোও নিজেদের না, সরকারি গাড়ি বলেই সন্দেহ হচ্ছে।

শেখর হাসতে হাসতে বললো, সঞ্জয় তুই কোনো গ্রামাঞ্চলে কখনো ঘুরিস নি বুঝতে পারছি। এইসব জায়গায় সরকারি কাজ কিভাবে হয় তোর কোনো আইডিয়া নেই!

সঞ্জয় বললো, তা হোকনা! সপরিবারে বেরিয়েছে—তার মানে অফ্ ডিউটি, এখন আমরা আর ওরা একই—চল, এগিয়ে গিয়ে কথা বলি।

জয়া বললো—দেখ রুণি, ভদ্রমহিলা কি রকম বিশ্রী ধরনের একগাদা গয়না পরেছেন।

অপর্ণা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এক পলক মাত্র সেই দলটির দিকে তাকিয়ে আর গ্রাহ্যই করে নি, এবার আলগাভাবে উত্তর দিলো, তুই অমনি শাড়ি-গয়না দেখতে বসলি।

চোঙা প্যান্ট পরিহিত ছোকরা মাউথ অর্গান রেখে ক্যামেরা খুলেছিল, ওদের দিকে চোখ পড়তেই থমকে তাকালো। চোখ সরু করলো! পাইপ-মুখে লোকটি কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন। রেঞ্জার পুরকায়স্থ তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন বলতে লাগলেন। পাইপ-মুখে

ব্যক্তিটি বললেন, অফ কোর্স, অফ কোর্স।

সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে বললো, লেট আস্ ইনট্রোডিউস আওয়ার সেলভ্স।

হাসিমুখে তিনি বললেন—একটু ভাঙা উচ্চারণ, কিন্তু নিখুঁত বাংলায় সব শুনেছি, ইনি ডি এফ ও মিঃ শাকসেনা, আমি হচ্ছি আর কে ভগট্। আপনারা বেড়াতে এসেছেন, খুব আনন্দের কথা—খুব আনন্দ, আমরা তা হলে অন্য জায়গায় যাচ্ছি, আপনার ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন?

শেখর বললো, না, আমরা ফ্যামিলি নিয়ে আসি নি, ওরা আমাদের বান্ধবী—এখানে ওদের বাড়ি আছে, দরকার হলে আমরা—।

কনজারভেটর সাহেব আড়চোখে আরেকবার তাকালেন জয়া আর অপর্ণার দিকে। ইজিচেয়ারে বসে জয়া অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু অপর্ণা চেয়ে আছে এদিকেই। থামে হেলান দিয়ে, একটু পা উঁচু করা, উদ্ধত ভঙ্গি অপর্ণার, অপর পুরুষ তার দিকে তাকালে সে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় না।

ডি. এফ. ও-র দিকে তাকিয়ে কনজারভেটর পরম উদার ভঙ্গিতে বললেন, তা হলে মিঃ শাকসেনা, এঁরা যখন এখানে রয়েছেন, আমরা তা হলে অন্য কোথাও—

মিঃ শাকসেনা চকিতে একবার দেখলেন রেঞ্জারের দিকে। ঈষৎ তীব্র দৃষ্টি। তিনি বিশেষ বিনয়ের ধার ধারেন না। জিজ্ঞেস করলেন, এঁদের কি এখানে রিজার্ভেসান ছিল? আমার দপ্তরে তো কোনো চিঠি যায় নি! এখানকার চৌকিদার কে?

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বললো, না, আমাদের রিজার্ভেসান ছিল না। খালি দেখে এখানে এসেছি—আমাদের অবশ্য থাকবার অন্য জায়গাও আছে এখানে।

কনজারভেটর বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুললেন, নো নো, ইউ এনজয় ইওরসেলভ্স। আমরা যাচ্ছি। পুরকাইট, নেক্সট্ বাংলোটা কত দূরে? টুয়েলভ মাইলস্? ফাইন! ম্যাটার অফ হ্যাফ অ্যান আওয়ার—লেটস্ মুভ।

শালওয়ার পরা মেয়েটি সারা শরীর দুলিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ড্যাডি, আর নট্ উই স্টেয়িং হিয়ার!

—নো ডার্লিং, উই আর মুভিং ফর আ বেটার রেস্ট হাউস।

ওরা আবার গাড়িতে ওঠার বন্দোবস্ত করছে, ততক্ষণে সার বেঁধে খাবার আসতে শুরু করেছে। সুখেন্দু পুরকায়স্থ ছুটে গিয়ে কনজারভেটরকে বললেন, স্যার, থোড়া টি আউর স্ন্যাক্স্—।

মিঃ ভগৎ গাড়িতে পা দিয়েছিলেন, পেছন ফিরে বললেন, এসব কি! এত খাবার? হো-য়া-ই?

মিঃ ভগৎ অত্যন্ত রেগে গেছেন মনে হয়। বললেন, তার মানে? এত খাবার—কে আপনাদের করতে বলেছে? এসব অন্যায়—আমাদের নিজেদের সঙ্গে খাবার আছে। তারপর অসীমের দিকে ফিরে বললেন, দেখেছেন কাণ্ড! এরা কি ভাবে—এখনো বৃটিশ আমলে আছে—সাহেবদের খুশি করার জন্য...দিস্ মেন্টালিটি...।

—স্যার, সামান্য অন্তত কিছু মুখে দিন—

—নো—।

রতিলাল সাহেবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলো খেতে। মোটা গিন্নী জানালেন, তাঁর এখন পেট ভর্তি, আচ্ছা, অত অনুরোধ করছে যখন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, পরে খাবেন—সুসি ডার্লিং টিফিন কেরিয়ার ঠো নিকাল দেও।

কনজারভেটর এবং ডি এফ ও সেই মুহূর্তে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। দু'জনেই এগিয়ে

গিয়ে গাছ পরীক্ষা করতে লাগলেন। শাল গাছে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষজন বিস্মৃত হয়ে অরণ্য বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌকিদার আর ফরেস্ট-গার্ডরা লাইন বেঁধে খাবারের প্লেট নিয়ে আসতে লাগলো। একটা নয়, তিনটে টিফিন কেরিয়ার ও ইট বক্স বেরুলো গাড়ি থেকে—আলাদা আলাদাভাবে খাবারগুলো ভর্তি হতে লাগলো তাতে। মোটা গিন্নী সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। শালওয়ার পরা মেয়েটি তাঁর কানে কানে কিছু বলতেই, তিনি অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন অপর্ণাকে। একটু বাদে কনজারভেটর হঠাৎ আবার বাস্তবজ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, ওয়েল, লেটস্ গো!

গাড়ি ছাড়বার আগে হাসিমুখে মিঃ ভগৎ ওদের দিকে চেয়ে বললেন, এনজয় ইয়োরসেলভ্স। উইস ইউ এ ভেরি গুড টাইম—। পুরকাইট, কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে—।

গাড়ি ছেড়ে যেতেই সুখেন্দু পুরকায়স্থ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললো, হ'য়ে গেলো! ব্যাড রিপোর্ট নির্ঘাত। এখন কার চাকরি যায়—।

অসীম বললো, চাকরি যাবে কেন? ভদ্রলোক তো বেশ ভালোই—।

—কী বলছেন স্যার, উনি কী রকম রেগে গেছেন বুঝতে পারলেন না!

—কোথায়, রাগ তো দেখলুম না।

—স্বয়ং কনজারভেটর বাংলোয় থাকার জায়গা পান নি—ওনাদের রাগ কি মুখে-চোখে ফোটে? দেখলেন না, আমায় সুখেন্দু না ডেকে পুরকাইট ডেকেছেন! খাবার একটুও মুখে তুললেন না।

খাবার বানানোই আপনাদের অন্যায় হয়েছে।

—অন্যায়? বৃটিশ আমল আঠারো বছর আগে শেষ হয়ে গেছে, আমরা জানি না? আমরা ঘাস খাই? এই সাড়ে তিনমাস আগে উনি যখন এসেছিলেন, কি রকম ভুঁড়িভোজন করে গেছেন, তা জানেন? সেবার আবার বলেছিলেন, চিংড়ি মাছ যোগাড় করতে পারো না? কত কষ্টে এবার সকালের ট্রেনে লোক পাঠিয়ে জামশেদপুর থেকে মাছ আনিয়েছি—শুধু আপনাদের দেখে ভড়ং—।

রতিলাল বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ স্পষ্ট ছলছল, সেদিকে তাকিয়ে সুখেন্দু পুরকায়স্থ বললেন, এই লোকটাই মরবে—।

সঞ্জয় তীব্র কণ্ঠে জানালো, মোটেই না, আপনি বেশি ভয় পাচ্ছেন, আমি ওর চাকরির দায়িত্ব নিলুম।

অসীম অপর্ণার দিকে ফিরে বললো, সঞ্জয়টা লেবার অফিসার তো, এখন ওর মধ্যে সেইটা জেগে উঠেছে। বেড়াতে এসেও চাকরির স্বভাব যায় না ওর। কপালে ঐ যে কাটা দাগটা দেখছো, একবার শ্রমিকরা ওকে মেরেছিল।

সঞ্জয় চেঁচিয়ে উঠলো আমরা এখানে এসে উঠেছি এবং আছি বলেই রতিলালের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে তা হতেই পারে না।

অসীম ব্যঙ্গ করে বললো, চাকরি ওর যাওয়াই উচিত। বৌয়ের অসুখ বলে লোকটা আমাদের জন্য কোনো কাজই করে নি। আজ বিকেলে এসে তিনবার চা চেয়েছি—তবু পাই নি। চাকরি ওর না গেলে আমিই ওর নামে কমপ্লেন করবো।

—অসীম, তুই ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না।

—খুব পারছি। বাংলোয় চৌকিদারের কাজ—বাংলোতে যে এসে থাকবে—তারই দেখাশুনা করা। কোনো অফিসারের নিজস্ব আর্দালি তো নয়। বৌয়ের অসুখ! আজ সারাদিন এখানে বসে

রান্না করলো কি করে?

রেঞ্জার সুখেন্দু পুরকায়স্থ উঠে এসে অসীমের কাঁধে হাত রেখে বিনীতভাবে বললো, অসীমবাবু, বৌয়ের অসুখ নিয়ে ওকে আর ভাবতে হবে না। সে আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও বাঁচবে না বোধহয়।

অসীম থতমত খেয়ে বললো, কি বলছেন আপনি! তা-ও ও এসেছে এখানে?

—এসব জায়গায় চাকরির কি রকম দাম আপনি জানেন না। সকালে আমি নিজে ওর বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের হেল্থ সেন্টারের ডাক্তার—তিনি বললেন, কয়েক ঘণ্টার বেশি আয়ু নেই। আমি দেখলুম, বউ যখন বাঁচবেই না তখন আর চাকরিটা হারায় কেন। ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়াতে হবে তো।

গাড়ি দু'খানা বাংলোয় গেট পেরিয়ে ডান দিকে বেঁকেছে, এখনো তেমন স্পিড নেয় নি, কোনাকুনি ছুটলে হয়তো এখনো ধরা যায়। হঠাৎ সঞ্জয় সেইদিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠলো, ওয়ান মিনিট, মিঃ ভগৎ, একটু দাঁড়ান, ওয়ান মিনিট, প্লিজ—

কাল রাত্রে যে জঙ্গলের মধ্যে রবি-অসীমরা উলঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করেছিল—সঞ্জয় সেখান দিয়েই ছুটে গেল। গাড়ি দুটো থেমেও গেল—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিঃ ভগৎ বললেন, এনি ট্রাবল্?

আপনাদের বিরক্ত করলুম, ক্ষমা করবেন। একটা কথা, আমরা এ বাংলোয় আছি বলে আপনারা কি বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন? তাহলে—।

—না, না, নাথিং অব দ্যাট সর্ট।

—দেখুন, এখানকার চৌকিদার এবং অন্যান্যদের ধারণা, আমরা আছি বলেই আপনারা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন এবং এজন্য পরে ওদের চাকরির ক্ষতি হবে—এরকম নাকি হয়।

—দেখুন মিঃ, এইসব ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনো রকম উৎসাহ আমাদের নেই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সঞ্জয় অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, আপনাদের দেরি করবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু ওরা ভয় পেয়েছে, আপনি যদি একটু মুখের কথা বলে যান যে, ওদের কোনো ক্ষতি হবে না—

—হোয়াট ডু ইউ মিন! আমি আমার সাবঅরডিনেটদের কাছে এক্সপ্লেইন করতে যাবো? আপনার এই অনুরোধকে কেউ কেউ অডাসিটি বলতে পারে।

—না, না, ওদের কাছে বলতে হবে না, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে ওদের কিছু—

—আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ব্যাপারে আপনাকে কেন প্রতিশ্রুতি দিতে যাবো? মাইন্ড ইওর ওউন বিজনেস।

—দিস ইজ অলসো মাই বিজনেস! আমরা এখানে এসেছি বলেই যদি একটা লোকের চাকরি যায় সেটা অত্যন্ত অন্যায়। তাতে আমাদের—।

—আপনাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি—এইটাই যথেষ্ট নয়।

—না, যথেষ্ট নয়। আপনার যদি কিছু আপত্তির থাকে আপনি আমাদের বলতে পারেন। পরে শুধু শুধু ঐ গরিবদের ওপর অ্যাকশন নেবেন না। আপনি জানেন না, ঐ চৌকিদারটার বইয়ের ভীষণ অসুখ, হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে—তবু এসেছে আপনাদের জন্য।

—অ্যাবসার্ড!

—না, না, সত্যিই। আপনি বরং আরেকবার আসুন।—সব শুনবেন। আমরাও এইমাত্র জানতে পারলাম!

—আপনারা এখানে মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি করতে এসেছেন, আপনাদের তো অত কথা ভাববার দরকার নেই!

আপনি ভদ্র ভাষায় কথা বলুন। ঐ মেয়েরা এখানকার লোকাল লোক—বেড়াতে এসেছে—আপনি শুধু শুধু খারাপ ধারণা করবেন না।

আপনি রাস্তা ছাড়ুন, আমি আর দেরি করতে পারছি না।

—না, আপনি বলে যান। যদি কারুর চাকরি যায়, আমি সহজে ছাড়বো না।

—ইজ দিস চ্যাপ এ লুনাটিক অব সামথিং—? ড্রাইভার চালাও!

সঞ্জয় সত্যিই অনেকটা পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো। তার কপালে কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে—সে বলতে লাগলো, আপনাদের খেয়ালখুশিতে লোকের চাকরি যাবে? ভেবেছেন কি? আমি শেষ পর্যন্ত দেখে নেবো—আমারও ইনফ্লুয়েন্স কম নেই! চালাকি নয়, ভেবেছেন জঙ্গলে আছেন বলে যা ইচ্ছে করবেন? আইন আছে, দরকার হয় আমি ওদের হয়ে কেস লড়বো, আমি—।

সঞ্জয়ের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি দুটো বেরিয়ে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে অসীম আর অপর্ণা আলাদা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। বিকেল শেষ হয়েছে একটু আগে, এখনো সন্ধে নামে নি, জঙ্গলের মধ্যে আবছা আলো। রবি তখনো না ফেরায় সবাই ক্রমশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোথায় তাকে খোঁজা হবে—তারও ঠিক নেই। জয়া-অপর্ণাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শেখর চেয়েছিল ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু অপর্ণা রাজি হয় নি। রবির ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

বাংলোটা আবার নির্জন। শুধু পাখিগুলো রাত্তিরের ঘুম শুরু করার আগে শেষবার ঝাঁক বেঁধে ডেকে নিচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর, অসীম অপর্ণাকে বলেছিল, চলো রুণি, একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসি। তোমাকে একটা অদ্ভুত ফুলগাছ দেখাবো!

অপর্ণা বললো, এখন জঙ্গলটা বেশ ভালো লাগছে—দিনের বেলা গাছগুলোকে এমন লম্বা লম্বা মনে হয়, আমার ভালো লাগে না—আমার খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

—না, খালি পায়ে হেঁটো না, কাঁটা ফুটতে পারে।

—কিছু হবে না। আপনিও জুতো খুলে ফেলুন-না। এখানে থাক—ফেরার সময় নিয়ে যাবো। ইস্, কতদিন খালি পায়ে হাঁটি নি!

অপর্ণার লালরঙের চটি জোড়ার পাশে অসীমও নিজের শু খুলে রাখলো। ওর মুখে অল্প একটু হাসির আভাস দেখা গেল। যেন ওর মনে পড়লো, কাল ওরা সমস্ত পোশাকই খুলে ফেলেছিল, কিন্তু অপর্ণাকে সে কথা বলা হয়তো ঠিক নয়।

কাল রাত্রে বাংলোয় ফেরার পথে একটা ফুলগাছ দেখেছিল অসীম, কী যেন এক নাম-না-জানা গাছ, যে গাছে একটিও পাতা নেই, শুধু ফুল। অপর্ণাকে সেই গাছটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। বললো, আশ্চর্য, গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু থোকা থোকা সাদা ফুল—এরকম গাছ আমি আগে কখনো দেখি নি!

অপর্ণা কিছুতেই ঠিক আশ্চর্য বোধ করে না, সে বললো, এ আর এমন কি, দিশি আমড়া গাছেও তো এক সময় কোনো পাতা থাকে না—শুধু ফুল, তারপর যখন ফুল থেকে ফল বেরোয়—তখন পাতা বেরোয় সেই ফলগুলোকে লুকোবার জন্য!

অসীম একটু আহত হয়ে বললো, না, না, আমড়া গাছ নয়, ছোট গাছ, এতে বোধহয় কোনো ফল হয় না, শুধু ফুল।

অপর্ণার ছিপছিপে ধারালো শরীর শুকনো পাতা ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে অনায়াসে ছন্দে। যে-কোনো মুহূর্তে কাঁটা ফোটার ভয়ে অসীমের প্রতি পদপাত সন্ত্রস্ত। ঝুপঝুপ করে অরণ্যের মধ্যে বড় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে। এখন আর গাছগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না। কোথায় সেই ফুল গাছ, অসীম আর খুঁজে পাচ্ছে না। একবার অসীম বললো, চলো রুণি, তা হলে আমরা ফিরে যাই, তোমার দিদি ভাববেন হয়তো—

—বাঃ, গাছটা খুঁজে পাওয়া যাবে না?

—গাছটা সত্যি আছে কিন্তু, আমি কাল রাত্তিরবেলাও দেখছিলুম,—মিথ্যে কথা বলি নি।

—আমি তো অবিশ্বাস করি নি—কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে তো! মিথ্যে হলে আমি ঠিকই বুঝতে পারতুম।

—ইস, তোমার ভারী গর্ব, তুমি সব মিথ্যে কথা বুঝতে পারো?

—সব! প্রত্যেকটা অক্ষর—চেষ্টা করে দেখুন।

—আচ্ছা, আমি যদি বলি, আমি তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি, তুমি বিশ্বাস করবে?

অপর্ণা হা-হা করে হেসে উঠলো। তার হাসি থামতেই চায় না। অন্ধকারে এখন তার শরীর ভালো দেখতে পাওয়া যায় না—শুধু তার শরীরময় হাসি—।

অসীম বললো, তুমি বিশ্বাস করলে না?

— কেন বিশ্বাস করবো না? এতে আর সত্যি-মিথ্যে কি আছে? এ তো অন্য রকম।

— না, অন্য রকম নয়, আমার মন বার বার এই কথাটা জানাতে চাইছে।

অপর্ণা অসীমের থেকে একটু দূরে, সে বললো, তাতে কি হয়েছে, আমরা ফুল ভালবাসি, কোকাকোলা ভালবাসি, চিকেন চৌমিন ভালবাসি, ট্রেনের জানলার ধারের সিট ভালবাসি, অনেক ছেলেকে ভালবাসি, অনেক মেয়েকে ভালবাসি—এর মধ্যে মিথ্যের কি আছে? আমাকে তো আপনি ভালবাসবেনই, আমি তো আর দেখতে খুব খারাপ না—

অসীম বললো, তুমি ছেলেমানুষ নাকি! আমি সে-রকমভাবে বলছি না—

— অন্য রকম আবার কী আছে বলুন! মনে করুন, এখানে আমার সঙ্গে যদি আপনার দেখা না হতো—তাহলেও আপনি কী করে আমাকে ভালবাসতেন? কিংবা, আমার বদলে যদি অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হতো—আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকেও কি আপনি ভালবাসতেন না?

— মোটেই না। আমি আগেও অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, কারুকে এমন ভালবাসি নি!

— বাসেন নি? আমি তো অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তার মধ্যে অনেককেই আমি ভালবাসি।

— যাঃ, সে রকম নয়। তুমি কি এতই ছেলেমানুষ যে, কিছু বুঝতে পারো না!

— বাঃ, এর মধ্যে না বোঝার কি আছে?

— তুমি বুঝতে পারছো না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

অপর্ণা আবার সেইরকম অনাবিলভাবে হেসে উঠলো। তার মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও, সেই হাসিরও যেন একটা রূপ আছে। অসীমের থেকে একটু দূরে সরে গেছে অপর্ণা, সেখান থেকেই সরল গলায় বললো, বাঃ, কষ্ট হবে কেন? আপনার সঙ্গে বেড়াতে আমার তো খুব ভালো লাগছে! কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু পাশাপাশি হাঁটছি, বেশ মজা, না?

অসীম সত্যিই এক ধরনের কষ্ট বোধ করছিল। সে অনুভব করছিল, অপর্ণার সঙ্গে তার প্রায় এগারো বারো বছর বয়েসের তফাত। এই বারো বছরে যেন আর একটা অন্য যুগ এসে গেছে।

অপর্ণার মতন মেয়েরা ভালবাসার কথা শুনলে হাসে, তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, শুনলে হাসে। ওদের কাছে এইসব কথা অন্য ভাষায় বলা দরকার। কিন্তু কী সেই ভাষা, অসীম জানে না। ভারী গলায় অসীম বললো, তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ!

— আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই! আমি অনেক কিছু বুঝি, আপনি যা ভাবছেন—তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু বুঝতে পারি।

— তাহলে এটা বুঝতে পারছো না, এক ধরনের ভালবাসা আছে, যা শুধু একজনেরই জন্য, যার জন্য বুকের মধ্যে টনটন করে, যাকে না পেলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। জানো না?

— আপনি জানেন বুঝি? আপনার আগেকার অভিজ্ঞতা আছে?

— না, নেই। আমি মেয়েদের ভালবাসতে ভয় পেতুম। আমি খেলা করতে জানি, কিন্তু ভালবাসা...মেয়েদের আমি একটু ভয়ই করি। তোমাকে নিয়েও খেলা করবো ভেবেছিলাম—কিন্তু তোমার হাতের রক্ত দেখে আজ কী রকম যেন অন্য রকম হয়ে গেল, তারপর, এই অন্ধকার জঙ্গলে এসে মনে হলো, আমি শুধু একমাত্র তোমাকেই ভালবাসতে পারি।

— আবার জঙ্গল থেকে বেরুলেই অন্য রকম মনে হবে।

— না—

— হ্যাঁ, আমি জানি।

— তাহলে চলো, এখুনি ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে দেখি—

— বাঃ, সেই গাছটা খুঁজবো না? সেটা দেখতেই তো এলাম।

— সেটা বোধহয় এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি টর্চ আনি নি...দেরি হয়ে যাচ্ছে...তোমাদের বাড়িতে কি ভাবছেন!

— এমন কিছু দেরি হয় নি। আসুন খুঁজে দেখা যাক অন্তত।

এখন দু'জনের কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে একটু দূরত্বে ওরা—আকাশে অভূতপূর্ব রকমের বিশাল চাঁদ উঠেছে, চাঁদটা যেন আকাশ থেকে অনেকটা নেমে এসেছে বনের মাথায়, মাঝে মাঝে তার জ্যোৎস্নায় ওরা পথ দেখতে পাচ্ছে—আর দু'জনের শরীরের অস্পষ্ট রেখা। তীব্র কোনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কোনো আলাদা ফুলের গাছ।

একটুক্ষণ নীরব থাকার পর অসীম আবার বললো, ইস্, তোমার হাতটা আজ কেটে দিলাম! ব্যথা হয়েছে? দেখি তোমার হাতটা!

হাতে হাত নিলে কি আর ব্যথা বোঝা যায়! কিন্তু অপর্ণা সে কথা বললো না, হাতটা এগিয়ে দিলো। অসীম হাতটা ধরেই রইলো, ছাড়লো না দু'জনে এখন পাশাপাশি। জঙ্গলের মধ্যে সত্যিই অনেক নিয়ম বদলে যায়। অসীম বুঝতে পারে, অপর্ণাকে ভালবাসার কথাটা সে খুবই তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছে। সরল ধরনের ছটফটে মেয়ে অপর্ণা, শরীরে সদ্য যৌবন পেয়ে তাতেই টলটল করছে। এখন গাঢ়স্বরে বলা কথা শোনার ধৈর্য তার নেই। কিন্তু পশুর মতন চঞ্চলতা বোধ করে অসীম। এই অন্ধকারে, অরণ্যের মধ্যে অপর্ণাকে পাশে পেয়ে তার বুকের মধ্যে—না, সারা শরীরে অস্পষ্ট যন্ত্রণা হয়, মনে হয়, আর সময় নেই, আর সময় নেই, অপর্ণাকে এক্ষুনি বুকের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলতে না পারলে আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। অসীম ওর আর একটা হাত অপর্ণার কাঁধে রাখলো, অপর্ণার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অসীম জিজ্ঞেস করলো, রুণি, তোমার ভয় করছে না?

— ভয় কি? আপনি তো সঙ্গে আছেন।

— আমাকে ভয় করছে না?

— কেন, ভয় করবে কেন?

— আমার সঙ্গে একলা এতদূর এসেছো—দু'দিন আগেও তো আমাকে চিনতে না! সত্যি, একটু ভয় করছে কিনা বলো?

— উহুঃ, আমি যাকে-তাকে ভয় পাই না।

— রুণি, আমাকে ভয় পাবার কারণ আছে। আমি একবার একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম।

অপর্ণা অসীমের হাত ছাড়িয়ে দিলো না, দূরে সরে গেল না, কেঁপে উঠলো না, শুধু বললো, ওসব কথা বলতে নেই!

— রুণি, তুমি তো সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারো, এটা আমি সত্যি কথা বলছি—আমি একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছিলাম, ইচ্ছে করে নয় যদিও, কিন্তু...আমার মন থেকে সে কথা কখনো মোছে না। সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়লেই আমার মনে হয়, আমি একটা জঘন্য লোক, আমি পাপী, আমি খুনী। আর জানো তো, একবার যে খুন করেছে, দ্বিতীয়বার সে খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না!

মুখ দেখা যাবে না জেনেও অপর্ণা একদৃষ্টে তাকালো অসীমের দিকে। অসীমের খাড়া নাক আর চিবুকের এক অংশ শুধু চকচক করছে জ্যোৎস্নায়। এলোমেলো হাওয়ায় এমন শব্দ হয় গাছের পাতায়, যেন মনে হয় এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। মাটিতে ঝরা শুকনো পাতায়, মাঝে মাঝে সর সর শব্দ হয়—মেঠো ইঁদুর কিংবা গিরগিটির—অথবা সাপও হতে পারে। সবই অনুমান, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ নয়। অপর্ণা একটু চঞ্চলভাবে বললো, আপনি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন বুঝি?

যে-হাত অপর্ণার কাঁধে ছিল, অসীম নিজেই সে হাত সরিয়ে নিলো। আপন মনে কথা বলার মতন বললো, জীবনের এর থেকে সত্যি ঘটনা আর কখনো ঘটে নি, আমার বাবা একটা মোটরগাড়ি কিনেছিলেন, উনিশ শো একষট্টি সালে, আমি রেড রোডে আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে ড্রাইভিং শিখতাম...ভালো করে শেখা হয় নি তখনো—এলগিন রোডের কাছে...আমার হাতে স্টিয়ারিং, মেয়েটি অফিস যাবার জন্য বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিল, আমি মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ভেবেছিলাম, বাঃ, বেশ দেখতে তো...ওকে আরেকবার ঘুরে দেখার জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম...আমার গাড়ির ঠিক সামনে একটা কুকুর পড়েছিল—এমনিই রাস্তার ঘিয়ে-ভাজা কুকুর, কিন্তু সেটাকে বাঁচাবার জন্য আমি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে...চাপা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা মরে গিয়েছিল, বীভৎস রুণি, সেই দৃশ্য এখনো আমি দেখতে পাই, পরে শুনেছিলাম—

— থাক, আর বলতে হবে না, এটা তো অ্যাকসিডেন্ট।

— না, শুধু অ্যাকসিডেন্ট নয়, পরে শুনেছিলাম, সেই মেয়েটির আর দু'মাস বাদে বিয়ে হবার কথা ছিল, আমারই একজন চেনা লোকের সঙ্গে।

— তবুও অ্যাকসিডেন্টই তো।

— অ্যাকসিডেন্ট হোক, কিন্তু শাস্তি পেলো কে জানো? আমাদের ড্রাইভার—তার তিন বছর জেল হয়, বিনা দোষে। আমার বাবা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক ছিলেন, পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে তার চেনা ছিল, দু'একজন মন্ত্রীকেও চিনতেন, নানান সাক্ষী যোগাড় করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সে সময় আমি গাড়িতেই ছিলাম না, শুধু ড্রাইভার ছিল, সে লোকটার বিনা দোষে...আমি স্বীকার করতে পারি নি তখন, আমার সাহস হয় নি। আমি খুব ভয় পেয়ে হাজারীবাগে পালিয়ে ছিলাম একমাস। সব সময় ভাবতাম, মেয়েটার রূপ দেখার জন্যই আমি অন্যমনস্ক হয়ে তাকে মেরে ফেলেছি। আমার বাবা ডিফেন্স ফান্ডে আমাদের বন্দুক দান

করেছিলেন, ইলেকশানে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন—আমি শান্তি পাই নি!

— শান্তি পেলেই বা কি হতো? মেয়েটার জীবন তো বাঁচতো না?

— কিন্তু অন্য একজন শাস্তি পেলো বলেই আমি অপরাধী হয়ে রইলুম চিরকাল। আমি ভুলতে পারি না, রুণি, আমাকে তুমি ভুলিয়ে দেবে?

— আমার সে-রকম কোনো ক্ষমতা নেই।

— কিন্তু রুণি, আমার আর উপায় নেই। তুমি বিশ্বাস করেছো তো আমাকে, আমি একজন কারুর কাছে সান্ত্বনা না পেলে—

— আমি মুখে সান্ত্বনা জানালে আপনার জীবনের কিছু বদলাবে? কিছু বদলাবে না!

অসীম দু'হাতে অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে, অপর্ণার কাঁধের কাছে মুখ এনে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, রুণি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি খারাপ লোক নই—

অপর্ণা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না, বিচলিতও হয় না, একটি মেয়ের ওরকম মৃত্যুর কথা শুনে কোনোরকম দুঃখও তার গলায় প্রকাশ পায় না। যেন পৃথিবীতে অনেক মেয়েই অনেকভাবে মরে—এই সত্যটা সে জেনে রেখেছে। অসীমের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও সে শিহরণ বোধ করে না, নিজের সম্পর্কেও ভয় না পেয়ে সে শরীরটা ঈষৎ শক্ত করে বলে, আপনি শুধু আপনার কথাই বললেন। আমার কথা তো ভাবলেন না। আমারও তো কোনো কথা থাকতে পারে?

— কী কথা বলো, আমি তোমার কথাও শুনবো।

—না, এখন নয়, ছাড়ুন।

—আমি আর পারছি না।

— ছিঃ, ওরকম করে না—ছাড়ুন!

অসীম অপর্ণাকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে, তার হাত স্পষ্টত অপর্ণার বুকে, সেখানে সে তার মুখ এগিয়ে আনে। অপর্ণা এবার সামান্য জোর করে বলে, ওরকম করছেন কেন? না, এখন ছাড়ুন। না—

— আমি পার পারছি না—আমি একবার তোমার বুকে মুখ রাখতে চাই, একবার—

— না, এখন নয়—

— এখন নয়? কখন? না, এই তো সময়, আমার একমাত্র আশা—

— এখন নয়।

— কখন?

— আসুন আগে আমরা সেই ফুল গাছটা খুঁজি—যেটায় পাতা নেই, শুধু ফুল।

— এখন হয়তো সেটাকে খুঁজে পাবো না! কিন্তু সেটা আছে, বিশ্বাস করো—

— কিন্তু সেটাকে খুঁজে পেতেই হবে! সেটা পাবার আগে আর কিছু না, ছাড়ুন—

১০

মেয়ে-পুরুষের একটা দল মাদল বাজাতে বাজাতে হাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, কিছু না ভেবেই রবি তাদের সঙ্গ নেয়। ওরা কিছু বলে নি, তোয়ালে-শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরা একটি লম্বা শক্ত চেহারার বাবু এদের সঙ্গে আসছে, তবু ওরা কিছু বলে নি। ঢ্যাং-ঢ্যাং করে অকারণে মাদল বাজাচ্ছিল একটা বুড়ো, দু'তিন জন নাচের ভঙ্গিতে দুলছিল, ওরা হাঁড়িয়া খেয়ে নেশা করেছে। মাইল দেড়েক সেই রকম যাবার পর একটা গ্রামের সীমানায় পৌছুলো।

এদের সঙ্গে আসবার আগে রবি কিছুই চিন্তা করে নি। হাট দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল,

ঘুরতে ভালো লাগছিল না। শেখর যখন জুয়া খেলায় মাতলো, সে তখন একটু সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। হঠাৎ মাদলের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকায়। বুড়োটা নেশার ঘোরে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, মাদলের ভারও যেন সইতে পারছে না, কিন্তু সরু সরু আঙুলে বোল তুলছে স্পষ্ট—পিড়কা পিটাং পিড়কা পিটাং পিড়কা পিটাং। সেই বাজনার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব দোলানি—রবির শরীরেও লেগেছিল সেই দোলা। পায়ে পায়ে রবি সেদিকে এগিয়ে এসেছিল, তার শরীরটাও দুলতে শুরু করেছে ততক্ষণে সেই মাদলের তালে তালে। বুড়োটার পিছন-পিছন চলেছে একটা ছোটখাটো শোভাযাত্রা। জন দশ-বারো মেয়ে-পুরুষ, কয়েকটা বাচ্চাও। রবির তখন মনে হয়েছিল, তার বন্ধুদের চেয়েও এদের সঙ্গেই তার যোগ বেশি। সে ওদেরই একজন হতে চায়। কোনো দ্বিধা না করে রবি ওদের দলে মিশে নাচতে শুরু করেছিল। কয়েকজন ফিরে তাকিয়েছে, মেয়েরা মুচকি হেসেছে, কিন্তু কেউ আপত্তি করে নি। আরও দু'চার জন সাঁওতাল ওরাও মেয়ে-পুরুষ মাঝপথে যোগ দিলো ঐ দলে। যেন একটা নদী চলেছে, যেখান থেকে জল এসে মেশে মিশুক।

মাঠের আলপথ ধরে নাচতে নাচতে এগিয়েছিল দলটা। কতদূর যাবে রবি কিছু ঠিক করে নি। একটু পরে কালকের সেই মেয়েটাকে দেখেছিল সে।

গ্রামের প্রথম বাড়িটার ঝকঝকে মাটির দাওয়া, উঠোনে কয়েকটা খাটিয়া বিছানো, একটা চকচকে চেহারার কচি আমগাছ ঠিক মাঝ উঠোন ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এক পাশের ঘরে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে একটা বুড়ি। সেই মাদল বাজানো বুড়োটা একটা খাটিয়ায় বসে বললো, এ বিটিয়া, দু'আনার হাঁড়িয়া—রসা মিলবেক?

গৃহস্থ বাড়ি হলেও সেখানে হাঁড়িয়া চোলাই হয়, গাঁয়ের মানুষ বাড়ি ফেরার মুখে যার যা ইচ্ছে খেয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, এই যে দলটি এলো—এরা সবাই সবাইর আত্মীয় বা চেনা নয়, স্রেফ একসঙ্গে জুটেছে ঐ মাদল বাজনার ছন্দের আকর্ষণে। সঞ্জয় ঠিকই বলেছিল, সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অনেকটা সভ্য আমেরিকানদেরই মতন, মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে মিলছে খোলাখুলি, নাচছে, মদ খাচ্ছে। কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই। নীল পাড় শাড়ি পরা মেয়েটিকে রবি আগে থেকেই চোখে চোখে রেখেছিল, এবার একটা খাটিয়ায় সেই মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলো, বললো, আমাকেও দু'আনার হাঁড়িয়া! তারপর সেই মেয়েটির দিকে ফিরে বললো, তুই খাবি?

মেয়েটি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, তু তো কাল হামাকে ফিরায়ে দিছিলি।

কথাটা শুনেই খুব কষ্ট হলো রবির। শেখরের ওপর রাগ হলো। কাল এই মেয়েটা আরও দু'টি মেয়ের সঙ্গে ওদের বাংলোয় কাজ চাইতে গিয়েছিল, ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। এই রকম মেয়েকে কেউ ফিরিয়ে দেয়? বরং ওদের ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই মেয়ে—এর শরীরের মতন মনও স্পষ্ট, এর ক্ষুধা স্পষ্ট, দাবি স্পষ্ট, অভিমান স্পষ্ট। রবি তো এই রকম সরলতার জন্যই উন্মুখ হয়ে ছিল। রবি মেয়েটির দিকে গভীরভাবে তাকালো।

— আজ আর ফেরাবো না। তোর স্বামী কোনজন?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে সুর করে বললো, উ তো কবে মরে গেছে। এতদিনে কুথায় আবার খোকা হয়ে জন্মালো!

আধঘণ্টার মধ্যে রবি জমিয়ে নিলো আসর। পকেট থেকে সে ফরফর করে একটার পর একটা নোট বার করতে লাগলো, সবাইকে হাঁড়িয়া খাওয়ালো। বেশি নয়, মাত্র সাত টাকা খরচ করতেই সে-বাড়ির সমস্ত হাঁড়িয়া—মদ শেষ হয়ে গেল। দলসুদ্ধ সকলেই তখন টং। নুন লাগানো সেদ্ধ ছোলা আর কাঁচা লংকা খেয়ে খেয়ে পেট ভরে গেল। রবির অসম্ভব ভালো লাগছে, সে জামাটা খুলে মাথায় পাগড়ির মতন বেঁধে ওদের সঙ্গে হৈহৈ করে নাচতে লাগলো। যেন,

শব্দ শুনতে পাচ্ছে রবি, পট পট করে ওর এক একটা বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কলকাতা, তপতী, অফিস, বাবা-মা—সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। আদিম, বনবাসী মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে সে এখন। ক্রিকেট খেলার মাঠেও রবি এতটা সাবলীল কোনোদিন হয় নি। ডান পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু তবু নাচের তালে তালে পা মেলাতে অসুবিধা হচ্ছে না তার। গানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, 'কোকিলা বাসা খুঁজে বাসা নাই, কাউয়োর বাসা আছে ছেনা নাই, কাউয়ো কোকিলায় বিয়া হব্যে এ—'

ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। হাট-ফেরত নারী-পুরুষ যাবার পথে এ বাড়ির নাচ-গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে যে-যার হাতের সওদা নামিয়ে রেখে ভিড়ে যাচ্ছে দলের মধ্যে। কার বাড়ি, কে-কার চেনা এসবের কোনো বালাই নেই। নাচ-গান হচ্ছে তো—সেই তো যথেষ্ট নেমন্তন্ন। এরকম অবিমিশ্র আনন্দের স্বাদ রবি কখনো পায় নি।

সেই বুড়োটার ক্ষমতা অসাধারণ। এতক্ষণ ধরে মদ খেয়ে যাচ্ছে, নেশায় শরীর টলমল, নাচের ঝোঁকে দু'একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে—কিন্তু মাদলের বোল নির্ভুল স্পষ্ট। উঠোন ভর্তি এক রাশ মুর্গী-ছাগল, সেগুলোও পায়ে পায়ে ঘুরছে।

খানিকটা বাদে ঐ ভিড়ের মধ্যে রবি দেখতে পেলো লখাকে। পুরানো কথা যেন সব কিছুই ভুলে গেছে রবি। কাল যে সে লখাকে মেরেছে, সে কথাও মনে নেই। হাঁড়িয়ার নেশা রবিকে পেয়ে বসেছে—সে লখাকে ডেকে হুকুম করলো, এই লখা, এখানে হাঁড়িয়া ফুরিয়ে গেছে। এই নে টাকা, যেখান থেকে পারিস হাঁড়িয়া নিয়ে আয়!

খানিকটা বাদে রবি উঠোন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েটা এসে বললো, কোথায় যেছিস?

রবির কোনো দ্বিধা হলো না, গলা একটু কাঁপলো না, স্পষ্টভাবে বললো, দাঁড়া পেচ্ছাপ করে আসছি।

মেয়েটারও কোনো দ্বিধা নেই, সে বললো, চল, তোকে জাগা দেখায়ে দিচ্ছি, সাপ খোপ আছে না জংলায়!

মেয়েটা ওকে নিয়ে এলো, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে, মাঠের মধ্যে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলা, সেই জায়গাটা দেখালো। মেয়েটা কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো, যেন এর মধ্যে কোনোই অস্বাভাবিকতা নেই।

রবি জিজ্ঞেস করলো, তোর নাম কি?

— দুলি! আর তুহার নাম তো রবি-ই?

— তুই কি করে জানলি?

— কাল ঐ যে রাগী পাগলা বাবুটো রবিই রবিই বুলাচ্ছিল।

রবি হয়তো এক পলক শেখরের মুখটা দেখতে পেলো। হেসে বললো, হাঁ, ঐ রাগী বাবুটা সত্যিই পাগলা। আচ্ছা দুলি, তুই কাল আমাদের বাংলোয় গিয়েছিলি কেন?

— কাম ঢুঁড়তে। কাম মিলে না পাঁচ রোজ...তোর মত একটো পাতলা বাবু একবার আমাকে বলেছিল কলকাত্তা লিয়ে যাবে। বাবুটো আর এলো না—বেমারই হলো, না মরে গেল!

— তুই কলকাতায় যেতে চাস্ কেন?

— কলকাতায় কত কাম মেলে, আর সাল ফুলমণি গেল, আখন সে তো লাল বেলাউজ কিনছে খুঁপার জাল কিনছে।

কলকাতা আর কলকাতা! এদিকে সবারই মুখে কলকাতা একটা ম্যাজিক শব্দ। কলকাতায় সব সমস্যার সমাধান, কলকাতায় গেলেই চাকরি! রবি বিরক্তভাবে হাসলো। এখান থেকে তো টাটানগর কাছে, কাজ পাবার সম্ভাবনা সেখানেই বেশি, তবু কলকাতা এত মোহময়। কলকাতায়

রাজমিস্ত্রিদের কাজে যোগান দেবার জন্য কিছু কিছু আদিবাসী মেয়েদের সে দেখেছে। কিংবা রাস্তা বানানোর কাজে। ছাপা শাড়ি উঁচু করে পরা, অনেক সময় পিঠে বোঁচকা-বাঁধা শিশু। হ্যাঁ, লাল ব্লাউজ পরে তারা, মাথার খোপায় জাল পরতেও পারে। তার জন্য দাম দিতে হয়, চামড়া খসখসে হয়ে আসে, চোখ শুকিয়ে যায়—কলকাতার হাওয়া এরকম।

এই মেয়েটা ধলভূমগড়ের বাজারে পাঁচ দিন বসে থেকেও কোনো কাজ পায় না—ব্লাউজ কেনার সামর্থ্য হয় নি, পেটে ভাতও জোটে না রোজ, তবু এরকম মসৃণ ভরাট শরীর কি করে পায় কে জানে! মাঠভর্তি চাঁদের আলো নেমেছে, সেই আলো পিছলে যাচ্ছে মেয়েটার শরীরে। রবি বললো, আমরা আর ওখানে ফিরে যাবো না, চল, মাঠের মধ্যে গিয়ে তুই আর আমি বসি।

মেয়েটার চোখ চকচক করে উঠলো। যেন সে ধন্য হয়ে গেল। তার জীবন সার্থক, কত তো মেয়ে ছিল, কিন্তু শুধু তাকেই কলকাতার ফর্সাবাবুটা দয়া করেছে, আলাদা তার সঙ্গে বসতে চেয়েছে। ধন্য তার জীবন। সে উঠে এসে সরাসরি রবির হাতটা ধরলো, পাখির বাসার মতন গরম তার হাত। সে পরম অনুনয় ভরা গলায় বললো, আমায় টাকা দিবি? আমি খুঁপার জাল কিনবো, একটো লাল বেলাউজ কিনবো।

রবির মনে হলো, এই তো সবচেয়ে সরল ও স্বাভাবিক—ওর নেই, ও চাইছে, রবির আছে, রবি দেবে। যে দেবে, সে তার বদলেও কিছু নেবে। সবারই ভিন্ন ভিন্ন রকম দেবার জিনিস আছে। অথচ, তপতীর জন্য সে...। রবি পকেটে হাত ভরে যা ছিল সব তুলে আনলো। মাত্র চোদ্দটা টাকা ছিল, সব তার হাতে গুঁজে দিতে দুলি অসম্ভব রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, রবির শরীরের সঙ্গে নিজের দেহ লেপটে আদুরে গলায় বললো, বাবু, তুই রাজা হবি।

রবি হাত দিয়ে দুলির শরীর বেষ্টন করলো। একটা হাত দুলির বুকে রেখে আর এক হাত ওর মুখে বুলোতে লাগলো। নরম মসৃণ চামড়া ভিজে ভিজে গরম, সারা শরীরটা কাঁপছে।

দুলি ফিসফিস করে বললো, চল।

মাঠ পেরিয়ে ওরা আবার বনের মধ্যে ঢুকলো। অন্ধকারে রবি কিছু দেখতে পায় না, শুধু অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দুলির শরীরটাই তার কাছে স্পষ্ট। দুলির সব কিছু চেনা, অরণ্যের প্রতিটি গাছের মাঝখানের ফাঁকটুকুও যেন তার মুখস্থ। শিশুর হাত ধরে যেমন অন্ধ বৃদ্ধ যায়, সেইরকম, রবি বুঝতে পেরেছিল, দুলির ছটফটে পায়রার মতন শরীরটা ছুঁয়ে থেকেই সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়ে দুলি সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাকে গিয়ে পৌঁছোলো।

গতকালের এঁটো শালপাতাগুলো সেখানে তখনো পড়ে আছে। ইঁট পাতা উনুনের ওপর কালো হাঁড়ি। কাল মেয়ে তিনটে এখানে ধুঁধুল সেদ্ধ আর ভারত খেয়ে পেটের জ্বালা মিটিয়েছে।আজ তাদের মধ্যে দুলি একা এখানে এসেছে এক রাজপুত্রের হাত ধরে। রেলগুদামের বাবু হারাধন বাবুর বাড়িতে বাগানের আগাছা পরিষ্কারের কাজ করতে গিয়েছিল দুলি, বাবুর ভাইপো তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল—কি কথায় একবার যেন তার হাত ধরেছিল। বাবু দেখতে পেয়ে নিজের লোককে কিছু বলে নি, দুলির নাকের ওপর একটা থাপ্পড় মেরে টেনে ফেলে দিয়েছিল। তার নিজের মরদটা যতদিন বেঁচে ছিল সেও তাকে মারতো। মার খেয়েছে ঠিকাদারের কাছে, রাজমিস্ত্রির কাছে। যারা টাকা দিয়ে কাজ করায়, তারা মাঝে-মাঝে মারবে, গালাগালি দেবে, একটু দোষ পেলেই টাকা কেটে নেবে—এসব তার কাছে স্বাভাবিক। শুধু আজ এই একটা বাবু—সব বাবুর সেরা বাবু—যত্ন করে হাত রেখেছে তার কোমরে, কী আদর করে ফিসফিস করে কথা বলছে কানে কানে!

দুলির কোনো লজ্জা নেই। পা দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে সে রবির হাত ধরে টেনে তাকে বসালো মাটিতে। তারপর রবির সেই হাতখানা সে তার বুকের ওপর রাখলো। নির্নিমেষে

তাকিয়ে রইলো রবির দিকে। কত কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে কোনো কথা জানে না। সব কথা একসঙ্গে বলার একমাত্র ভাষায় সে আপন মনে হেসে উঠলো।

এই রাত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। সে কাজ পায় না, তার স্বামী নেই, সে একটা সামান্য হতভাগ্য প্রাণী, আর এই সুন্দরপানা বাবুটা এত লোক থাকতে, তাকেই আদর করছে, তার এই সামান্য শরীরটাকে নিয়ে কত খেলা করছে, এত সৌভাগ্য সে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল? ফুলমণির চেয়েও আজ সে বেশি সৌভাগ্যবতী। এক কথায় বাবুটা তাকে দশ টাকা আর চার টাকা দিয়ে দিলো, ঐ টাকার বদলে সে কত কাজ করে দিতে রাজি ছিল, সে এ জন্য কুয়া থেকে পাঁচশো বালতি জল তুলে দিতে পারতো, সাত দিন ঝাঁকা ঝাঁকা ইঁট বইতে পারতো, বাবুটা সে সব কিছু চায় না, বরং বাবুটা উল্টে তাকে কত আদর করছে।

রবিও কোনো কথা বলছে না। দুলির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে সে এক ধরনের শিহরণ বোধ করছে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে এসে জমা হচ্ছে রাগ আর অভিমান। সাতাশ বছর বয়েস—এর আগে রবি কখনো কোনো মেয়েকে এমনভাবে স্পর্শ করে নি। অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার, অনেক মেয়ে তাকে অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত দিয়েছে—কিন্তু রবি তপস্বীর মতন নিজেকে পবিত্র রেখেছিল শুধু একজনের জন্য। তপতী সান্যাল, নিউ আলিপুরে, রবির হাতে রেখে বলেছিল...তপতীর মুখখানা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠলো, রক্তবর্ণের ঠোঁট, দেবী-দুর্লভ দু'টি টানা টানা চোখ—এই তপতীকেই রবি একদিন দেখেছিল...। অসহ্য রাগে রবির বুক গুমড়ে উঠলো, সে সব কিছু ভেঙে ফেলবে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে। একটা চাপা আওয়াজ করে রবি পাগলা পশুর মতন দুলির বাহু কামড়ে ধরলো। ভয় পেয়ে দুলি চিৎকার করে উঠতেই রবির সম্বিৎ ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি বললো, না, তোকে না, তোকে না, তুই খুব ভালো, তোকে আমি খুব ভালবাসবো।

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো রবি, দুলিকেও পাশে শোয়ালো নিজের হাতের ওপর। মাথার ওপর জ্যোৎস্না-ধোঁয়া নীল আকাশ, তাতে অসংখ্য তারা। এত বেশি তারা কলকাতার বাইরের আকাশেই দেখা যায়। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কাছে কালপুরুষ! রবি বললো, তুমি দেখো।

শাড়িটা খুলে ফেলেছে দুলি, আনন্দে উঁ-উঁ শব্দ করছে। অন্ধকারে মিশে আছে ওর কালো দৃঢ় শরীর। রবি ওর বুকে আঙুল রেখেছে, কোমর বেষ্টন করে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দুলির মুখে রসুন রসুন গন্ধ, চুলে বাসি জলের গন্ধ, শরীরে শ্যাওলার গন্ধ। দুলির ঠোঁট বড় বেশি নোনতা, বুক নোনতা।

এসব গন্ধ আর স্বাদ যে খুব মনোরম তা নয়। কিন্তু, এতকাল মেয়েদের কাছে এসেই রবি পেয়েছে শুধু শ্যাম্পুর গন্ধ, সাবানের গন্ধ, পাউডারের গন্ধ, স্নো'র গন্ধ—সেই সব গন্ধ প্রত্যেকটি রুচিশীল। কিন্তু এই রকম একটি প্রাকৃতিক সরলতার জন্য যে রবির মন এমন উন্মুখ হয়েছিল—রবি তা নিজেই জানতো না। চিরকাল কলকাতা শহরে মানুষ—কোনোদিন গ্রামে থাকে নি, কোনোদিন খালি পায়ে হাঁটে নি, নাগরিক গন্ধ, নাগরিক হাওয়ায় সে চিরকাল অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এই মাটিতে শুয়ে থাকা তার কাছে মনে হচ্ছে কত স্বাভাবিক, যেন কতকাল এই রকম জঙ্গলে শুয়ে থেকেছে সে। যে-কোনো নারীকে পাশে শোবার জন্য ডেকেছে। জঙ্গলের জীবনই মানুষের রক্তে এখনো মিশে আছে, একটুও ভুলতে পারে নি।

পাগলের মতন ছটফট করতে লাগলো রবি, দুলির গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এক সময় সে তার সম্পূর্ণ শরীরটাকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিলো। মেয়েটার শরীরে যেন কোনো হাড় নেই, চামড়া দিয়ে আগুনের হালকা বেরুচ্ছে. উরু দুটো দিয়ে প্রবলভাবে চেপে ধরেছে রবিকে,

রবি অশ্রান্তভাবে বলতে লাগলো, তুই খুব ভালো, তুই খুব ভালো—আমি তোকেই এতদিন চেয়েছিলাম, আর কাউকে চাই না। তার নিঃশ্বাস এত ঘন ঘন যেন দম আটকে আসবে। রবির শুকনো, গন্ধ বুকের মধ্যে যেন এতদিনে একটা সত্যিকারের নরম হাতের ছোঁয়া।

খানিকক্ষণ পর, মাটিতে চিৎ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইলো ওরা। চাঁদ এখন এসে পড়েছে মাথার ওপর, ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না রোদ্দুর আড়াল করার মতনই রবি চোখের সামনে হাত দিয়ে, জ্যোৎস্না আড়াল করছে। ওর শরীরের ওপর রাখা দুলির একটা ঠাণ্ডা হাত। রাত এখন তার ঠিক নেই। রবির তখন কিছুই মনে পড়ছে না, কলকাতা নয়, বাংলোর বন্ধুরা নয়, শুধু চোখের সামনে একটা জ্যোৎস্না-আড়াল করা হাত।

দুলি রবিকে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, বাবু, আমার কলকাতা নিয়ে যাবি ?

রবি বললো, না।

—নিয়ে যাবি না ?

—না, কলকাতা ভালো না।

—তুই চলে যাবি?

—না, যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। কথাটা শুনে দুলির কি মনে হলো কে জানে, সে ধড়মড় করে উঠে কনুইতে ভর দিয়ে রবির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সাধারণ গলায় বললো—যাঃ, ঝুট বাত্। তুই কেন এখানে থাকবি? তুই কলকাতায় কত ভারী কাম করবি, পয়সা কামাবি—ইখানে এ জঙ্গলে কি আছে?

রবি হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে বললো—থাক, চুপ কর। এখন কলকাতার কথা আমার মনে করতে ইচ্ছে করছে না।

খানিকটা বাদে রবির সব মনে পড়লো, খেয়াল হলো বাংলোয় ফেরার কথা। উঠে পোশাক পরে বললো, চল দুলি, আমায় রাস্তা দেখিয়ে দিবি। দুলি তখনো উঠতে চায় না, তার ইচ্ছে সারারাত ওখানেই থাকে। এত আনন্দ—তার জীবনে আর কখনো কি আসবে? এখুনি সে শেষ করতে চায় না।

কিন্তু দুলি তবু উঠে পড়লো।

সামনেই সেই পাকা রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে ওপারে জঙ্গলে আবার ঢুকলো। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে জঙ্গলে শুকনো পাতা ভাঙার আওয়াজ। যেন অলৌকিক মুহূর্তে অশরীরীরা জঙ্গলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুলি তখনো রবির শরীরের সঙ্গে লেগে আছে, মাঝে মাঝে বড় বড় আরামের নিঃশ্বাস ফেলছে। রবি সিগারেট ধরালো।

একটু বাদেই সামনে কয়েকটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি চোখে পড়লো। রবি বুঝতে পারলো, তার বন্ধুরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। রবি চেঁচিয়ে উঠলো, শেখর? আমি এখানে—

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া এলো না। পায়ের শব্দ থেমে গেল। রবি আবার বললো, শেখর? কে?

এবার ওদিক থেকে উত্তর এলো, উই সেই হারামি বাবুটা!

গলার আওয়াজ শুনেই রবি চিনতে পারলো। দুলি ভয়ে কেঁপে উঠলো, তার রাজকুমারের এবার বিপদ! অন্ধকার থেকে জ্যোৎস্নার নিচে এগিয়ে এলো চারটে ছায়ামূর্তি, প্রত্যেকের হাতে লাঠি, তার মধ্যে একজন লখা। আর একজন প্যান্ট-শার্ট পরা সাঁওতাল, স্পষ্টতই সে কোনো সাহেবের বাড়ির খানসামা কিংবা সহিস ছিল, কিংবা মিশনারিদের কাছে লেখাপড়া শিখেছে, কেননা, সে বৃটিশ উচ্চারণে বলে উঠলো, ইউ বাস্টার্ড, ইউ সান অব এ বিচ-ইউ থিংক সানথাল গার্লস আর ফ্রি—

রবি গর্জন করে উঠলো, কে রে? কে তুই?

আর কিছু বলার আগেই একটা লাঠির ঘা লাগলো রবির আহত পায়ে। দুলি কঁকিয়ে উঠলো ভয়ে। একজন এসে দুলির মুখ চাপা দিলো। রবি আহত নেকড়ের মতন শূন্যে লাফিয়ে উঠে, দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, হারামজাদা!

সে লখার টুটি চেপে ধরতে গেল। লখা এক ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিতেই আরেকজন আবার লাঠির ঘা কষালো। আঘাতটা লাগলো রবির ঘাড়ে। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে রবি মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পাক গড়িয়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো। এখন সে ছুটে পালাতে পারে—তার এক পায়ে ব্যথা হলেও তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারবে না।

কিন্তু রবির সে কথা মনেই পড়লো না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপর দারুণ ঘৃণায় সে থুঃ করে থুতু ফেললো। ওদের মধ্যে একজন দুলির হাত দুটো পিছমোড়া করে শক্তভাবে ধরে আছে, অন্য হাতে দুলির মুখ চাপা দেওয়া। বাকি তিনজন রবিকে আবার আক্রমণ করার জন্য উদ্যত। রবির সমস্ত শিরা-উপশিরা সজাগ হয়ে উঠলো, অন্যদের ছেড়ে সে লখার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো। প্যান্টপরা লোকটি লাঠি তুলতেই রবি তাকে বিদ্যুৎ গতিতে পাশ কাটিয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে 'হারামজাদা' বলে সে লাফিয়ে গিয়ে ধরলো লখার ঘাড়। মুহূর্তের মধ্যে তাকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে এনে নাকের পাশে মারলো একটা প্রবল ঘুষি। হাতের মুঠোটা তার তক্ষুনি রক্তে ভিজে গেল। লখারও গায়ের জোর কম নয়, রবির ওরকম ঘুষি খেয়েও সে অজ্ঞান হলো না, দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন চিৎকার করে সে সাঁড়াশির মতন শক্ত হাতে রবির গলা চেপে ধরতে গেল। রবি জুডোর কায়দায় হাঁটু তুলে মারলো লখার চিবুকে। কিন্তু আর সরে যাবার সময় পেলো না—বাকি দু'জন তাকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে। একটা গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরলো।

প্যান্টপরা লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস করে রবির গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বললো, হারামির বাচ্চা! কলকাতা থেকে এখানে ফুর্তি করতে এসেছো? এই জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে ফেলবো আজ!

রবির নড়ার ক্ষমতা নেই। চোখ দুটো স্থির করে তাকিয়ে রইলো। তক্ষুনি এই গোটা পৃথিবীটা ধ্বংস করার ইচ্ছে হলো তার। সে শক্তিও তার আছে, অনুভব করলো। লখা নিজের চোয়াল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে রক্তমাখা থুতু ছিটিয়ে দিলো রবির মুখে। ওদের মধ্যে বাকি লোকটা একটু ভদ্র, সে হাত দিয়ে লখাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, বাবু, আপনারা কি ভাবেন? চিরকাল এক জিনিস চলবে? যাকে তাকে ধরে মারবেন? আমাদের মেয়েদের কোনো ইজ্জৎ নেই? আমাদের মেয়েদের নিয়ে যা খুশি করবেন?

রবি গর্জন করে উঠেলো, বেশ করবো! যে চোর, তাকে নিশ্চয়ই মারবো। মেয়ে আবার আমাদের তোমাদের কি? যাকে যার পছন্দ হবে—আমি কি ওকে জোর করে ধরে এনেছি?

দুলি এই সময় কোনোক্রমে হাত ছাড়িয়ে এসে আর্তগলায় বললো, বাবুকে ছেড়ে দে! ইটা ভালো বাবু! প্যান্টপরা লোকটা এক থাপ্পড় দিয়ে দুলির কথা থামিয়ে দিলো। রবিও নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ঝটকা মেরে, তেড়ে এলো ঐ লোকটার দিকে। মাথায় লাঠির ঘা পড়ায় রবি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো—শেখর! শেখর! সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ঘুষি পড়লো তার মুখে। রবি টলে যেতেই আবার একটা লাঠির ঘা লাগলো তার শিরদাঁড়ায়, রবি মাটিতে পড়ে গেল, ধপাধপ করে জুতোসুদ্ধ লাথি এবং লাঠির ঘা পড়তে লাগলো তার শরীরে। রবির আর প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই, অসহ্য যন্ত্রণায় আস্তে আস্তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার চেতনা হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, তার মনে হলো, এ লোকগুলো

কেন তাকে মারছে? কেন সে শাস্তি পাচ্ছে? কিন্তু যাই হোক, আজ সে কোনো অন্যায় করে নি, কোনো পাপ করে নি, তার পূর্ব জীবনে যত অন্যায় সে করেছে আজ সেইজন্য সে শাস্তি পাচ্ছে। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে সে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। দুলির মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে ছেঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে সরে পড়লো সেই চার ছায়ামূর্তি।

১১

শেখর আর জয়া বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে, বাগানে পাতা টেবিল-চেয়ার তুলছে রতিলাল। টেবিলের উপর ফাঁকা ডিসগুলো পড়ে আছে, ঝকঝকে পরিষ্কার, খাবার দেবার সুযোগ হয় নি রেঞ্জার সুখেন্দুর সঙ্গে কী যেন কথা বলছে সঞ্জয়। সেদিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে শেখর জয়াকে বললো, আজকাল একটা মুশকিল হয়েছে, কোনো একজন মানুষ—ভালো কি খারাপ, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এই কনজারভেটর লোকটিকে ঠিক কি রকম মনে হলো তোমার? আমার তো দেখে মনে হলো বেশ ভদ্র, এলো আর চলে গেল, কোনো খাবার ছুঁলো না। অথচ শুনেছি, অন্যবার এসে নাকি সব খাবার হালুম হুলুম করে খায়! আশ্চর্য, লোকটা তা হলে—ভদ্র না ভণ্ড?

জয়া হেসে বললো, আপনি সব মানুষ দেখেই বুঝি ভালো কি খারাপ বিচার করতে চান? আমার তো লোকটাকে দেখে কিছুই মনে হয় নি। সব লোকই তো এই রকম—খানিকটা খানিকটা ভণ্ড—

—যাঃ, সব লোকই ভণ্ড হবে কেন?

জয়া অন্যদিকে মুখ ফেরালো, খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, হয়, আমি জানি।

জয়ার উদাসীনতাটুকু লক্ষ করে শেখর চুপ করে গেল। জয়া দূরের জঙ্গলের ক্রমশ অবনত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। শেখর একটা সিগারেট ধরালো।

রতিলাল কাপ-ডিসগুলো জড়ো করেছিল একজায়গায়, সেগুলো তুলতে গিয়েও নামিয়ে রেখে হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে উঠলো। চমকে উঠলো ওরা দু'জনেই। ধুতির ওপর খাকি পোশাকে জোয়ান চেহারার মানুষ, সে হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে কান্নায় আকুল হলো। যেন অমন একজন বয়স্ক পুরুষকে ওরকমভাবে কখনো কাঁদতে দেখে নি, সে রকমভাবে জয়া বললো, ওমা, ওকি? ওরকম করছে কেন?

শেখর বললো, বোধহয় ওর চাকরি যাবে!

—লোকটা চাকরি যাবার ভয়ে ওরকমভাবে কাঁদছে নাকি? আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি। এমন কিছু আজ হয় নি, যে জন্য ওর চাকরি যেতে পারে—আমার তো মনে হয়, সঞ্জয়বাবু যে রকম অকারণে কনজারভেটরের সঙ্গে রাগারাগি করলেন—সেই জন্যই ওর চাকরি যেতে পারে। নইলে সত্যিই তো এমন কিছু হয় নি—

—সঞ্জয়টা ঐরকমই...পাগলামি যত সব! এইসব লোকদের ব্যাপারে ওর একটা গ্লানি আছে। দেখছো না, ওর কপালে ঐ কাটা দাগটা—

—কী হয়েছিল?

—থাক, সে গল্প শুনে আর কি হবে!

জয়া বনেদী বাড়ির মেয়ে ও বউ, অকারণে কৌতূহল প্রকাশ না করার একটা বংশগত শিক্ষা আছে। সেই কারণে, ও বিষয়ে আর প্রশ্ন না করে আপন মনে বললো, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এমন একটা কিছু না, যদি চাকরি যায়ও, আমি বাবাকে বলে আমাদের কাঠের গোলার ওর একটা চাকরি করে দেবো না-হয়।

সঞ্জয়ের গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ছে, সুখেন্দুকে সে কি যেন বোঝাতে চাইছে ব্যস্তভাবে। বারান্দা থেকে শেখর আর জয়া তাকিয়ে রইলো সেদিকে। জয়া শেখরকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, সঞ্জয়বাবু কি আপনাদের অনেকদিনের বন্ধু?

শেখর বললো, হ্যাঁ, ছেলেবেলার বন্ধু। এখন মাঝে মাঝে অনেকদিন দেখা হয় না, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না কখনো।

—উনি কিন্তু আপনাদের তিন বন্ধুর থেকে অনেক আলাদা।

—কেন আলাদা?

—দেখলেই মনে হয়। সব সময় কপাল কুঁচকে থাকেন—কি একটা ব্যাপারে যেন খুব চিন্তিত। বেড়াতে এসেও সে কথা ভুলতে পারেন নি!

শেখর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়লো, মাসখানেক আগে এক ভোরবেলা সঞ্জয় তার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, ক্ষতবিক্ষত মুখ...। শেখর বললো, সঞ্জয় সত্যিই আমাদের মতন নয়, ও খুব ভালো ছেলে।

জয়া বললো, তা দেখলেই বোঝা যায়, বড্ড বেশি ভালো।

সঞ্জয় উত্তেজিতভাবে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। সারা মুখে তার ক্রোধ ও বেদনা। বললো, জানিস, কি ব্যাপার? কল্পনা করা যায় না! কোন দেশে আছি? আজ সকাল দশটায় ডাক্তার এসে বলে গেছে ওর বউ আর এক বেলাও বাঁচবে কি না সন্দেহ আর ও সারা দুপুর এখানে সাহেবদের সেবার জন্য...ঐ রেঞ্জার সুখেন্দুটা ওকে চাকরির ভয়, অমানুষিক ব্যাপার—

শেখর বললো, ঠিক জানতুম, কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। ঐ রেঞ্জারেরই স্বার্থ...

—কে জানে কার স্বার্থ! অসহ্য! অসহ্য! মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না যে দেশে...আমি রেঞ্জারকে বলেছি, ওকেও যেতে হবে, আমরা সবাই রতিলালের বাড়ি যাবো, চল—।

—রতিলালের বাড়ি? আমরা সবাই গিয়ে কি করবো?

—বাঃ, আমাদের একটা দায়িত্ব নেই? আমরা শুধু আরাম করবো আর পয়সা দিয়ে দায় মেটাবো? এ সময় আমাদের সবারই ওর পাশে দাঁড়ানো দরকার—।

—সবাই গেলে কোনো লাভই হবে না—শুধু ওকে বিব্রত করাই হবে। তা ছাড়া রবি আসে নি, অপর্ণা, আর অসীম কোনোদিকে গেলে, তুই বরং একা যা, তোর যাওয়া দরকার।

—দরকার? আমার একার কি দরকার! আমার একার দায়িত্ব নাকি?

—হ্যাঁ, তোরই যাওয়া দরকার, তাতে তোর ভালো হবে। তুই যা।

—তার মানে?

সঞ্জয় দু'চোখ এক রেখায় করে তাকালো শেখরের দিকে। শেখর স্পষ্ট স্পন্দনহীন চোখে চেয়ে আছে। দু'এক মুহূর্ত, তারপর সঞ্জয়ের মুখে আলতো ব্যথার আভাস ভেসে উঠলো, নিঃশ্বাস ফেলে চাপা গলায় সে বললো, হ্যাঁ যাই, আমি ঘুরে আসি—।

এতক্ষণ অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত ছিল সঞ্জয়। হঠাৎ বদলে গেল। দুর্বল মানুষের মতন আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে, বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে না নেমে সিঁড়ি ভাঙলো, সেইরকমই মন্থরভাবে এগিয়ে রতিলালের কাঁধে হাত রেখে বললো, চলো!

ওদের দলটা ডাকবাংলোর এলাকার প্রান্তে পৌঁছালে শেখর চেঁচিয়ে বললো, সঞ্জয়, বেশি দেরি হলে একটা খবর পাঠাস কারুকে দিয়ে!

নিরালা হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ শেখর আর জয়া চুপ করে বসে রইলো। অন্ধকার ভারী হয়ে নেমে এসেছে, বাংলোয় আলো জ্বালা হয় নি, দৃষ্টির সীমায় কোনো আলো নেই, পাশাপাশি

ওরা দু'টি মূর্তি ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে ডাক, কখনো জোর, কখনো বা মৃদু, হাওয়ায় গাছের পাতায় বিভিন্ন রকম শব্দ। এক একটা পাতার সরসরানি এমন হয়, যেন মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই, আকাশে একছিটে মেঘ নেই, আস্তে আস্তে সেদিনের চাঁদ তার সেদিনের নিজস্ব রীতিতে জেল্লা ছড়াচ্ছে।

খানিকটা পরে শেখর সচকিত হয়ে বললো, রুণি আর অসীম এখনো এলো না! ওদের খোঁজ করবো?

—থাক না, একটু বেড়াচ্ছে।

—কিন্তু এই অন্ধকারে... তোমাদের ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, এমন কিছু দেরি হয় নি। কোনো দরকার থাকলে পরমেশ্বর খবর নিতে আসতো। জানে তো এখানেই আছি।

—কিন্তু তোমার শ্বশুর কি ভাববেন?

—কি ভাববেন?

—মানে, তোমরা দু'টি মেয়ে এতগুলো ছেলেছোকরার সঙ্গে ডাকবাংলোয় আছ...।

জয়া ঝরঝর করে হেসে বললো, আমার শ্বশুরের চেয়ে আপনারই ভাবনা যে বেশি দেখছি!

শেখর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না, মানে ভাবতে তো পারেন—যাই হোক—আমাদের সঙ্গে খুব বেশি তো চেনা নয়—।

বাইরে এলে অনেককিছুই অন্য রকম! কলকাতায় আলাপ হলে সহজে আড়ষ্টতা ভাঙতে চায় না, কিন্তু বাইরে জঙ্গলের মধ্যে সব জিনিসটা সহজ হয়ে যায়—আপনার বন্ধুদের সঙ্গে তো মনে হচ্ছে যেন কতদিনের চেনা!

—তোমর সঙ্গে আমার তো অনেক দিনেরই চেনা। কলেজে...তখন বোধহয় তোমার দিকে দু'একটা ইশারা ইঙ্গিতও করেছিলাম।

—বাবাঃ, কলেজে আপনি যা দুর্দান্ত ছিলেন! সব মেয়েদের আপনি বিষম জ্বালাতন করতেন।

—জ্বালাতন করবো না কেন? মেয়েরা আমাকে পাত্তা দিতেই চাইতো না। সেইজন্যই জ্বালাতন করে...

—বাজে কথা বলবেন না! একমুখ দাড়ি রেখে, ময়লা জামা-প্যাণ্ট পরে কলেজে এসে খুব বীরত্ব দেখাতেন! ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া আর অসভ্য কথা বলার জন্যই তো আপনি বিখ্যাত ছিলেন!

—শুধু সেইজন্য বিখ্যাত ছিলুম? আমি ম্যাট্রিকে থার্ড স্ট্যান্ড করেছিলাম না?

—ভারী তো থার্ড! ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড তো হন নি! সেইজন্যই ফার্স্ট সেকেন্ড বয়দের থেকে আলাদা হবার চেষ্টায় ঐরকম চ্যাংড়া সেজে থাকা।

—আমি তোমার সঙ্গে কোনোদিন চ্যাংড়ামি করেছি?

আপনার সাহসই হতো না! একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে আপনি একটা মেয়েকে...কি যেন নাম ছিল মেয়েটার? সোফিয়া? হ্যাঁ, সোফিয়া চৌধুরী, দারুণ দেখতে, ইংলিশ-এ অনার্স ছিল, আপনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে পেছন থেকে গিয়ে তার চোখ টিপে ধরেছিলেন। সারা কলেজে ছড়িয়ে ছিল সেই গল্প। আমি শুনে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে ওরকম করতে এলে চালাকি বার করে দিতাম!

শেখর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কি করতে?

জয়া ডান হাতটা মুঠো করে তুলে ধরে বললো, গুম্ গুম্ করে পিঠে কিল মারতাম। দু'জনেই

অনাবিলভাবে হেসে উঠলো। জয়া বললো, এখন কিন্তু আপনি অনেক শান্ত হয়ে গেছেন।

শেখর খানিকটা চিন্তিতভাবে বললো, শান্ত হয়ে গেছি? কি জানি! কিন্তু এ জঙ্গলে বেড়াতে এসে আমার কিন্তু সত্যিই নিজেকে খুব শান্ত লাগছে। এই দেখো না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে নিরালায় বসে আছি, কোথাও কেউ নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে একটুও দুষ্টুমি করার চেষ্টা করেছি? মনে হয়, আগেকার সব কিছু যেন ভুলে গেছি।

তারপর শেখর হঠাৎ ধড়মড় করে ওঠার চেষ্টা করে বললো, দাঁড়াও আলোটা জ্বেলে দিই।

—না, থাক না। এই তো বেশ।

—কিন্তু তোমার শ্বশুর সত্যিই কিছু ভাববেন না? যদি হঠাৎ খোঁজ করতে আসেন—

—আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার শ্বশুর কিছুই ভাববেন না, সন্ধের পর তাঁর কিছুই ভাববার সময় নেই। সন্ধের সময় তিনি ঠাকুরঘরে ঢোকেন, তারপর অন্তত তিনটি ঘণ্টা—।

—সে কি! খালি বাড়িতে আর দু'টি মেয়ে...

বাড়ির দু'টি মেয়ে নিজেদের যথেষ্ট সামলাতে পারে, তা তিনি জানেন। তাছাড়া, ওঁরও তো কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, মানুষ জনের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তত একা হয়ে ওঁর কান্নার সময় তো চাই। দুঃখ-কষ্ট মানুষটার কম নাকি?

শেখর ধীর স্বরে বললো, জয়া, তোমার একা থাকার দরকার হয় না? তোমার কান্নার জন্য সময়—।

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় জয়া বললো, না। কাঁদতে যাবো কেন? আমার কান্নার কি আছে?

শেখর একটু সময় চুপ করে রইলো। জয়ার আংটির হীরেটা ঝিকমিক করছে অন্ধকারে, সেই হীরের জ্যোতি দেখে বোঝা যায়, জয়ার হাত খুব কাছেই মাটিতে ভর দেওয়া। একটু বাদে শেখর হাত বাড়িয়ে জয়ার হাতটা ধরলো, খুব নরমভাবে জিজ্ঞেস করলো, তিন বছর কেটে গেল, জয়া, সত্যি তোমার কষ্ট হয় না?

তুমি শরীরে কোনো জ্বালা টের পাও না?

—না। শরীরের মধ্যে আমি সব সময় একটা অপমান টের পাই।

—কিসের?

—বুঝতে পারলেন না? ভালবেসে বিয়ে করলুম, সে কেন দূর দেশে গিয়ে আত্মহত্যা করলো? এই রহস্য যতদিন না বুঝতে পারি, ততদিন নিজের প্রতি একটা অপমান—

—হয়তো আত্মহত্যা নাও হতে পারে। যদি দুর্ঘটনা হয়?

—তাহলেও! বিলেত যাবার কি দরকার ছিল? বাড়িতে কোনো অভাব নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল, তবু আমাদের কারুকে না জানিয়ে চুপিচুপি সব ব্যবস্থা করে হঠাৎ একদিন চলে যাওয়া—

—তোমরা আগে থেকে কিছুই বুঝতে পার নি?

—আমি বোধহয় ভালবাসা কাকে বলে তাই কখনো বুঝতে পারি নি।

শেখর এবার একটু বিরক্ত হয়ে জয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, তোমরা মেয়েরা ভালবাসা কথাটা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করো! দু'জনে দু'জনকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে, সচ্ছল সংসার, অমন সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে—মানুষের সুখি জীবন তো একেই বলে, এর মধ্যে ভালবাসা নিয়ে বেশি ন্যাকামিই বা আসে কোথা থেকে আর আত্মহত্যার প্রশ্নই বা আসে কি করে?

জয়া আলতোভাবে হেসে বললো, আপনি বুঝি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—করবো না কেন? কিন্তু ভালবাসা নিয়ে অতটা মাতামাতি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না! একজনকে না পেলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল—ন্যাকামি! আমাদের রবিটা যেমন...যাক্‌গে! তোমরা দু'জনে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে—তারপর মতের অমিল হতেও বা পারে কখনো-সখনো—একটু-আধটু অন্যদের সঙ্গেও ফষ্টি-নষ্টি চলতে পারে—কিন্তু এর মধ্যে আত্মহত্যার কথা ওঠে কি করে?

একটুও বিচলিত না হয়ে বেশ সপ্রতিভ গলায় জয়া বললো, সেই কথাই তো বলছি, আপনিই বলুন না, এর মধ্যে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমি কোনো অবিশ্বাসের কাজ করি নি, তবু কেন ও আমাকে তুচ্ছ করে দূরে চলে গেল? বিয়ের আগে ও বলেছিল, আমাকে না পেলে ওর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিয়ে করে ও তো আমাকে পেয়েছিল, তবুও কেন নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিলো! একটা মেয়ের কাছে এটা কত বড় প্রশ্ন আপনি বুঝতে পারবেন? ভালবাসা ছাড়া আর কিসের কাছে আমি এর উত্তর খুঁজবো?

নিজের প্রশ্ন নিজেরই কাছে ফিরে আসায় উত্তর না দিতে পেরে শেখর একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, কি জানি! এসব সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না! এখানে সব অন্যরকম। আমি একটু শোবো!

অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝুঁকে পড়ে শেখর জয়ার কোলের ওপর মাথা রাখলো। জয়া আপত্তি করলো না, বরং নিজের দুই উরু সমান করে বিশাল কোল পেতে দিলো। শেখর ওপরে তাকালো, জয়ার দুই চোখের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পাওয়া যায় অন্ধকারে। বিধবা কথাটার মধ্যে কি দারুণ নিঃস্বতা আছে, কিন্তু জয়ার মাংসল দুই উরু ও ভরাট কোল, বেশবাস ভেদ করে বেরিয়ে আসা শরীরের চাপা সুগন্ধ—জয়াকে শুধু নারী বলেই মনে হয়। শেখরের শরীরটা হালকা হয়ে এলো। চাপা গলায় বললো, জয়া, কলেজে পড়ার সময় তোমাকে আমি একদিন আইসক্রিম খেতে আমার সঙ্গে কোয়ালিটিতে যেতে বলেছিলুম। তুমি যাও নি। যদি যেতে—

—গেলে কি হতো?

—তাহলে, বলা যায় না, হয়তো আমাদের দু'জনেরই জীবন অন্যরকম হতো।

—অন্য অনেক মেয়ে তো আপনার সঙ্গে আইসক্রিম খেতে যেতে রাজি হয়েছিল জানি—তাদের জীবন কি অন্যরকম হয়েছে?

—কলেজে পড়ার সময় তুমি কিন্তু খুব গম্ভীর ছিলে। কফি হাউসে কিংবা ওয়াই, এম, সি, এ-তে কেউ কোনোদিন তোমায় আড্ডা দিতে দেখে নি। বাড়ির গাড়িতে কলেজে আসতে, আবার বাড়ির গাড়িতে ফিরে যেতে। কেউ কথা বলতেই সাহস করতো না। আমি যেদিন তোমাকে কোয়ালিটিতে যাবার কথা বললুম, তুমি যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠেছিলে। তুমি বলেছিলে, আমি? না, না, আমি কোথাও যাই না, গেলেও আপনার সঙ্গে যাবো কেন?

শেখর জয়ার গলা নকল করেছিল বলে জয়া রেগে উঠে শেখরের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে বললো, মোটেই আমি ওরকমভাবে বলি নি! ইস্‌, আমি ভয় পাবো!

শেখরও দু'হাত উঁচু করে জয়ার কোমরে সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টা করে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলেছিলে! কেন বলেছিলে? কেন আমার সঙ্গে সেদিন যাও নি?

—বেশ করেছি যাই নি। কেন যাবো? এক একদিন এক একটা মেয়েকে তো ঐ একই কথা বলতেন! অনেক মেয়েই তো গেছে আপনার সঙ্গে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি রাজি হও নি বলেই তোমার কথাটা বেশি করে মনে আছে। আজ এই মুহূর্তে, কেন জানি না, মনে হচ্ছে, যদি তুমি যেতে তাহলে জীবনটা—

—ওসব যদির কথা বাদ দিন। তাহলে তো বলা যায়, যদি আমি না জন্মাতুম—!

—ওকি কথা? তোমার কি জীবনের ওপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেছে নাকি?

—মোটেই না। কেন? আমার কি দোষ?

—তোমার দোষের কথা তো বলি নি।

—তাহলে, ওসব কথা আর বলতে হবে না।

—আচ্ছা আর বলবো না। আমার এখানে শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছে। আর একটু শুয়ে থাকি?

জয়ার যে হাত শেখরের চুলের মুঠি ধরেছিল, সেই হাত এখন সেখানেই বিলি কাটছে। শেখরের যে হাত জয়ার কোমরের কাছে সুড়সুড়ি দেবার জন্য উঠেছিল, সে হাত এখন সেখানেই থেমে আছে। খুব কাছেই জয়ার দু'টি স্তন, শেখরের হাত একবারও লোভী হয়ে সেদিকে উঠতে চায় নি। বরং হাতটা নেমে এলো, ভর রাখলো জয়ার উরুর পাশে। সিল্কের শাড়ি পরেছে জয়া, শেখরের হাত সেখানে ভারী আরাম পায়। যেন পরম স্নেহের ভঙ্গিতে শেখর সেখানে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

কলেজ-জীবনে জয়ার সঙ্গে ভালো করে আলাপও হয় নি শেখরের, এক ক্লাসে পড়তো, কিন্তু কখনো নিরালায় বসে নি দু'জনে। অথচ, এতদিন পরে দেখার পর, কোন মন্ত্রবলে কাদের সম্পর্ক কত সহজ হয়ে এসেছে। এই জঙ্গলের নির্জনতা, পাতা আর বাতাসের ফিসফাস, অন্ধকারের নিজস্ব অবয়ব—এখানে যেন কোনো স্বভাব-বিরুদ্ধ কৃত্রিমতাই মানায় না।

কিছু না ভেবেই শেখর হঠাৎ প্রশ্ন করলো, জয়া, তোমার বিয়ের পর কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

এরকম কোনো প্রশ্নের জন্য জয়া একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। অবাক হয়ে বললো, কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—এমনিই। বিয়ের পর হানিমুনে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই কোথাও?

—গিয়েছিলাম, মাউণ্ট আবু-তে। কিন্তু সে কথা শুনে আপনার কি হবে?

—বলো না! কবে গেলে, কতদিন ছিলে, এইসব। তোমার জীবনের কোনো একটা আনন্দ-মধুর সময়ের কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে!

জয়া একটা হাত শেখরের চোখে চাপা দিয়ে বললো, বোকারাম একটি! বুঝতে পারছেন না, ঐ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই?

দু'জনেই আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। দু'জনেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। অন্ধকারে প্রথমে চোখে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে—তারপর অন্ধকারকে অন্তত স্পষ্ট দেখা যায়। জঙ্গলে অবশ্য এখন আর অবিমিশ্র অন্ধকার নেই। কোথাও কোথাও ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়েছে—শেখর কিন্তু চাপ-বাঁধা অন্ধকার অংশগুলোর দিকেই তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমশ তার অস্বস্তি জাগলো। রাত বাড়ছে। রবিটা এলো না! অসীম, অপর্ণা এলো না!

শেখর বললো, অসীম আর রুণি এলো না—ওরা পথ হারিয়ে ফেলে নি তো?

নিশ্চিন্ত গলায় জয়া বললো, এর মধ্যে আবার কোথায় হারাবে? তাছাড়া রুণি কখনো পথ হারায় না!

—কেন? টর্চ সঙ্গে নেয় নি, এই অন্ধকারে, অসীমের সঙ্গে ও একা গেছে, তোমার ভাবনা হচ্ছে না?

—উ হুঃ! আপনি রুণিকে চিনতে পারেন নি। ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হয়, বুদ্ধিতে আমার চেয়ে বেশি! রুণি একবার মাত্র পথ ভুল করেছিল, তাও মাঝপথ থেকে ফিরে

এসেছে, আর কখনো ভুল করবে না। জানি।

—ঐটুকু তো মেয়ে, তার সম্বন্ধে অমন জোর দিয়ে বলার কি আছে!

—ঐটুকু হলেও, জানেন না, ও মানুষকে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারে। কাল রবি যখন আমাদের ওখানে বিকালবেলা—

—কাল রবি তোমাদের ওখানে—

—হ্যাঁ, কাল যখন একা গেল—

যেন শেখর ঘটনাটা জানে। সেইরকমভাবে শেখর কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলো না। কাল ওরা দু'জন যখন মহুয়ার দোকানে গিয়েছিল, সঞ্জয় গিয়েছিল রতিলালের বাড়িতে, রবি তো সে সময় জয়াদের বাড়িতে যেতেই পারে, এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে শেখর বললো, হ্যাঁ, কাল আমরা যখন জঙ্গলে বেড়াতে গেলাম, রবি গেল না, তোমাদের বাড়িতে যাবে বলেছিল—

হ্যাঁ, রবি হন্তদন্ত হয়ে গেল, গিয়ে বললো, একা একা ভালো লাগছে না। আমরা তখন কাটলেট ভেজে আপনাদের জন্য পরমেশ্বরের হাত দিয়ে পাঠাবো ঠিক করছিলুম, আমরা বললুম, আপনি এসেছেন যখন ভালোই হলো। কিন্তু কি রকম বন্ধু আপনার, পাগল। আর কোনো কথাবার্তা নেই, রুণির দিকে তাকিয়ে বললো—চলো, তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখন বেড়াতে বেরুবো। আমি বললুম, সে কি, এখন বেড়াতে যাবে কি করে? রবি কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি, রুণির দিকেই তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে, সোজাসুজি রুণির হাত ধরে টান মেরে বললো—কেন, যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে—আমার একা একা ভালো লাগছে না।

শেখর এবার বিস্ময় গোপন করতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, রুণিকে একা যেতে বলছিল?

জয়া সামান্য হেসে বললো, তাই তো মনে হয়। যাই বলুন, আমার কি দারুণ ভালো লেগেছিল। তখনো তো রুণির সঙ্গে বলতে গেলে ওর ভালো করে পরিচয়ই হয় নি, সেই গাছতলা থেকে আমাদের বাড়িতে আসার পথটুকু পর্যন্ত যা কথা হয়েছে, কিন্তু তবুও একটা ছেলে সোজাসুজি এসে ওরকম হাত ধরে বললো—চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেই হবে—এর মধ্যে এমন একটা পৌরুষ আছে, আমি আগে কখনো দেখি নি। কিন্তু বেচারাকে কষ্ট দিতেই হলো। রুণিই হাসতে হাসতে বললো, কি করে যাবো? আমরা যে এক্ষুনি ঘাটশীলা যাচ্ছি। সকালে বলেছিলুম, ভুলে গেছেন। রবি তাতেও দমে নি, বললো, ঘাটশীলা যেতে হবে না। রুণি বললো, ইস্, কেন আপনার সঙ্গে যাবো! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়ে গেল। রবি বললো যাবে না? ঠিক আছে। আমি চললুম তা হলে! যেমন এসেছিল তেমনি হঠাৎ আবার তখুনি চলে এলো কাটলেটগুলো হাতে নিয়ে। কত বসতে বললুম—আমি রুণি দু'জনেই, আর বসলো না। রবি চলে যাবার পর রুণি বললো, জানিস দিদি, ওকে দেখলেই মনে হয়, উনি যখন আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, তখন ঠিক আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে অন্য কারুর কথা ভেবে ওসব বলছিলেন। উনি কারুর ওপর খুব অভিমান করে আছেন, তাই ছটফট করছিলেন সবসময়—। আমি তক্ষুনি বুঝলুম, রুণি ঠিকই বলছে। বলুন, সত্যি কিনা?

শেখর হাসার চেষ্টা করে বললো, রবি আবার কার ওপর অভিমান করে থাকবে, ও অমনিই পাগলাটে—

শেখর গোপনে আবার একটু ভেবে নিলো। প্রথম দিনের আলাপেই রুণিদের বাড়িতে রবি একা গিয়েছিল? বলে নি তো! রবির এ ধরনের স্বভাব নয়। কিন্তু কেন? এ-ও আর এক ধাঁধা। শেখরের এ সম্পর্কেও আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করলো না।

শেখর জয়ার কোলে উপুড় হলো। জয়ার নরম উরুতে ওর মুখ ডুবে যাচ্ছে! কিন্তু কোথাও কোনো শান্তি বিঘ্নিত হয় নি। শেখর যেন এতখানি শান্তিতে বিশ্বাস করতে পারলো না, তাই পরখ করার

জন্য জয়ার উরুতে একটা চিমটি কাটলো। জয়া উঃ শব্দ করে বললো, এবার বুঝি আরম্ভ হলো ছেলেমানুষী? তাহলে কিন্তু—শেখর আবার মুখ ফিরিয়ে বললো, না জয়া, সত্যি ছেলেমানুষীই। এখানে শুয়ে থাকতে এত ভালো লাগছে—এক্ষুনি উঠতে বলো না। একটা কথা বিশ্বাস করবে? আমি কোনো মেয়ের কোলে এতক্ষণ মাথা দিয়ে আগে কখনো এমন চুপ করে শুয়ে থাকি নি। এতটা ভালোমানুষ আমি কোনোদিনই তো ছিলুম না! আমার পাগলামি একটু বেশি, আমি শরীরকে সব সময় শরীর হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছি। কিন্তু আজ কেমন অন্যরকম লাগছে, পুরোনো কোনো কথা মনে পড়ছে না। জঙ্গলে এসে জংলী হবার বদলে আমি হঠাৎ সভ্য হয়ে গেলুম! আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো, তোমার ভালো লাগছে না? তোমার পাগলামি করতে ইচ্ছে করছে না?

জয়া হেসে বললো, আমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমার পাগলামি করতে ইচ্ছে করছে না।

—এই তিন বছরের মধ্যে কোনোদিন ইচ্ছে করে নি?

—না। ঐ যে বললুম, ভালবাসার ব্যাপারে আমি ভুল বুঝেছিলুম কিনা, তার উত্তর না পেলে—

—আঃ! আবার সেই ভালবাসা নিয়ে বাড়াবাড়ি! ভালবাসা-টাসা ছাড়াও শরীরের তো কতগুলো নিজস্ব দাবি আছে—নাকি, তোমাদের মেয়েদের সেটা নেই?

—থাকবে না কেন? কম বয়সে ঐ পাগলামিটা বেশি থাকে। আমার বয়েস এখন সাতাশ, সেটা খেয়াল আছে?

—সাতাশ? তাই নাকি? তা হলে তো একেবারেই বুড়ি!

জয়া হাসলো না। আপন মনে কথা বলার মতন বলে গেল, বুড়ি হই নি, কিন্তু কম বয়েসের সেই ছটফটানিটা আর নেই! মেয়েদের একবার সন্তান হলে শরীরের রহস্যটা অনেকখানি জানা হয়ে যায়। তখন হৃদয়ের রহস্য জানার জন্য খুব ব্যাকুলতা আসে। অবশ্য আপনারা একথা বুঝবেন না। ছেলেরা সাতাশ কেন, সাতচল্লিশেও ছেলেমানুষ থাকে।

—জয়া, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না সত্যিই! তুমি কি বলতে চাও, তুমি তোমার স্বামীর স্মৃতি নিয়েই চিরকাল থাকবে?

—বয়ে গেছে আমার, কোনো মরা মানুষের স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাতে! আমি জানতে চাই আমার ভালবাসায় কোথায় ভুল হয়েছিল, যাতে দ্বিতীয়বার আর ভুল না করি।

—আবার সেই ভালবাসা! জ্বালালে! দেখছি ঘুরে ফিরে সেই একজায়গায়।

—আপনি সত্যিই ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—আমি ভালবাসায় বিশ্বাস করি না। ভালবাসতে চাওয়াটুকু বিশ্বাস করি। সেই চাওয়াটুকুতেই যা আনন্দ। ভালবাসা কোনো পবিত্র অলৌকিক ব্যাপার নয়!

—কিন্তু শরীরের ছটফটানি কি সেই চাওয়াটুকুও ভুলিয়ে দেয় না? শরীরের নিজস্ব চাওয়া একটা গোটা মানুষকে চাইতে ভুলিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, থাক ও কথা। জয়া, তোমার হাতটা দাও তো—

জয়া তার হীরের আংটি পরা ঝিকমিকে হাতখানা শেখরের কপালে রাখলো। তারপর চমকে উঠে বললো, এ কি, আপনার গা এত গরম কেন!—জ্বর হয়েছে নাকি?

জয়ার চমকানি দেখে শেখর কৌতুক বোধ করলো। হাসতে হাসতে বললো, না, কিছু হয়

নি। এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। তোমারও হাতখানা খুব গরম—

এবার জয়াও হেসে উত্তর দিলো, আমারও এরকম মাঝে মাঝে হয়।

—তা হলেই দেখছো, আমাদের দু'জনের জীবনে কতটা মিল!

—জীবনের না হোক, আমাদের দু'জনেরই নিশ্চয়ই দুঃখের মিল আছে।

শেখর সচকিত হয়ে বললো, দুঃখ? আমার আবার দুঃখ কি?

—লুকোচ্ছেন কেন, আপনি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না, আপনারও কি দুঃখ কম নাকি? আপনারও চাপা দুঃখের কথা আমি জানি।

—তুমিও বুঝি রুণির মতন সব মানুষের সত্যি বা মিথ্যে কথা বলে দেওয়ার প্র্যাকটিস শুরু করেছো!

—রুণির মতন অতটা না হলেও, আপনি এতক্ষণ আমার কোলে মাথা দিয়ে আছেন, আপনার সম্পর্কে অন্তত এইটুকু বলতে পারবো না! বলুন, কোনো দুঃখ নেই?

—না, নেই। দুঃখ নেই, গ্লানি নেই। থাকলেও কিছু এখন মনে পড়ে না।

—কিছুই মনে পড়ে না? তা হলে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?

—ভ্যাট্! চালাকি হচ্ছে, না? মোটেই কথার মাঝখানে মাঝখানে ব্র্যাকেটে দীর্ঘশ্বাস ফেলা আমার অভ্যেস নয়! সত্যিই জয়া, এই জঙ্গলে এসে আমার মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে। আমি যে কোনোদিন কোনো মেয়ের শুধু কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থেকে এত আনন্দ পাবো—এ ধারণাই আমার ছিল না। আমি যেন বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি! কি জানি, আমার উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে!

জয়া শেখরের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলো। তারপর খুব মৃদুভাবে বললো, আপনি এখনো ছেলেমানুষ, ভীষণ ছেলেমানুষ। এবার উঠে পড়ুনতো। আমার পা যে ব্যথা হয়ে গেল।

শেখর উঠে বসলো। পাশাপাশি বসে জয়ার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, জয়া, তোমাকে আমি একদম বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে হবেও না। একদিনেই বোঝা যায়?

শেখর হঠাৎ গলার স্বর বদলে ডাকলো, জয়া—। জয়া কোনো উত্তর দেবার আগেই, ঠিক সেই সময়, দূরের জঙ্গল থেকে আর্তনাদের মতন ডাক ভেসে এলো, শেখর—। প্রথমটা শেখর ঠিক বুঝতে পারলো না, পরে আরেকবার। অনেকটা দূর হলেও এবার চেনা গেল রবির গলা। শেখর অতি দ্রুত উঠে পড়ে বললো, রবির গলা না? বিপদে পড়েছে মনে হচ্ছে—দৌড়ে শেখর বারান্দার আলো জ্বাললো। ঘর থেকে বড় টর্চটা নিয়ে এসে বললো, জয়া, তুমি এখানে বসো, আমি দেখে আসছি।

জয়া বললো, আমি একা বসে থাকবো নাকি? আমিও যাবো।

দু'জনে নেমে জঙ্গলের মধ্যে ছুটলো। শেখর প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো, রবি। রবি! কোনদিকে?

রবির আর কোনো সাড়া নেই। জয়ার হাত ধরে আন্দাজে ছুটছে শেখর। একটু আগে শেখরের শরীরে যে একটা মদির আলস্য এসেছিল তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। শেখর বিপদের গন্ধ নিঃশ্বাস টেনে বুঝতে পারে। রবির বিপদের কথা টের পেয়ে সে জয়ার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে ভুলে গেছে। শক্তভাবে জয়ার হাত চেপে ধরেছে, ছুটতে জয়ার অসুবিধে হলেও জোরেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে শেখর, আর মাঝে মাঝে রবির নাম ধরে চিৎকার করছে।

একটু বাদেই মানুষের গলা পাওয়া গেল, অসীম ডাকছে শেখরের নাম ধরে; শেখর চেঁচিয়ে বললো, তুই শুনেছিস? রবির গলা—

—হ্যাঁ—

—কোনদিকে?

—বড় রাস্তার দিকে, তোর ডান দিকে।

অসীম আর অপর্ণা একটুক্ষণের মধ্যেই ওদের সঙ্গে এসে মিললো। শেখর ওদের বললো, তোরা কতদূরে ছিলি? রবির এরকম গলার আওয়াজ, কোনো বিপদ-টিপদ হয়েছে নিশ্চয়ই—

জয়া বললো, রুণি তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

—আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে মরছিলুম, পথ হারিয়ে ফেলেছি।

—পথ হারিয়ে ফেলেছিলি?

—ঠিক হারাই নি, অসীমদা বলছিলেন আমাকে একটা কি সাদা ফুলগাছ দেখাবেন, ঘুরে মরছিলুম, খুঁজে পাচ্ছিলুম না কিছুতেই।

—এই অন্ধকারে—

—ভেবেছিলুম, বাংলোয় আলো দেখতে পাবো। তোরা আলো জ্বালিস নি বুঝি?

চার জনেই তখনো ছুটছে। শেখরের হাতে জোরালো আলো, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে জঙ্গলের প্রতিটি কোণ। অসীম বললো, আমার একবার মনে হয়েছিল, আওয়াজটা হবার পর কয়েক জন লোক ছুটে পালালো।

—তোদের থেকে কতটা দূরে?

—বেশ খানিকটা দূরে। মনে হলো রাস্তার পাশে, তার একটু পরেই একটা ট্রাক গেল।

—ডাকাত-টাকাতের পাল্লায় পড়ে নি তো! যে রকমভাবে ডাক দিলো, উঃ, এমন ছেলে—

খুঁজতে খুঁজতে ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছোলো। রাস্তার ওপাশে সেই মিলিটারিদের ভাঙা ব্যারাকটাও দেখে এলো। আবার ফিরে এদিকে একটু খুঁজতেই শেখরের টর্চের আলো পড়লো একটা মানুষের শরীরে।

দুমড়ে মুচকে পড়ে আছে রবি, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি ভিজে গেছে, জামা-প্যান্ট ছেঁড়া, চুলের মধ্যেও চাপ চাপ রক্ত। মাথার কাছে একটা সাদা ফুলগাছ—গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু ফুল। অসীম আর রুণি যে গাছটা খুঁজছিল, সেই গাছটার নিচে পড়ে আছে রবি। শেখরের টর্চ স্থির হয়ে রইলো। জয়া 'আব—' ধরনের একটা শব্দ করে হাত দিয়ে মুখ চাপা দিলো। অসীম ফিসফিস করে বললো, মরে গেছে! মরে গেছে!

সাদা ফুলগাছটা ও রবিকে একসঙ্গেই দেখতে পেয়েছিল অপর্ণা। সে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে বললো, একি! না, না—।

অপর্ণা ছুটে যেতে চাইছিল, শেখর একটা হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে বললো, জয়া, ওকে ধরো। অপর্ণা তবুও ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠলো, না, না—। অসীম এক পা এগোতে এগোতে বললো, মরে গেছে—বুঝি মরে গেছে রবি, উঃ, এত রক্ত—

শেখর অবিচলিতভাবে বললো, কিছু হয় নি! মরতে পারে না, অসম্ভব, আমি কখনো মৃত্যু দেখি নি, আজও দেখবো না। কোনো ভয় নেই। জয়া, তুমি রুণিকে ধরো, কোনো ভয় নেই—

অপর্ণাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, জীবনে সে কখনো এ ধরনের দৃশ্য হয়তো দেখে নি। মুখ দিয়ে একটা চাপা কান্নার স্বর বেরুচ্ছে তার, জয়ার হাত ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলছে, আমি একবার দেখবো, একবার—।

অসীম এসে অপর্ণার আর একটা হাত ধরতেই সে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে হিংস্র গলায় বললো, ছেড়ে দিন! আমাকে ছোঁবেন না।

শেখর এসে রবির মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালো। মুখখানা রক্তে মাখামাখি, প্রায় চেনাই যায়

না। একটা জ্বলন্ত সিগারেট রবির ঠিক মাথার কাছে পড়েছিল, ওর চুলের খানিকটা পুড়িয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেখর তাড়াতাড়ি সেটাকে নিবিয়ে দিলো, রবির একটা হাত খুঁজে বার করে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলো।

সেই সাদা ফুলগাছটার ফুলের পাশে পাশে বড় কাঁটা। একটা কাঁটা শেখরের গায়ে বিঁধতেই শেখর বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকালো। বেশ শক্ত বুনো গাছ, শুধু ফুল ফোটায় আর ফুলের পাশে ধারালো কাঁটার পাহারা রেখেছে। রবির একটা হাত সেই গাছের ওপর। গাছটাকে শেখর সাবধানে ধরে হেলালো, আর কোনোদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করে নি, গাছটাকে মাটিতে নুইয়ে তার ওপর বুটজুতো পরা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সে সেটাকে মড় মড় করে ভেঙে জায়গাটা পরিষ্কার করলো। তারপর বললো, অসীম, আমি মাথাটা তুলে ধরছি, তুই পা দুটো সাবধানে ধর, রবিকে এখুনি বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে।

১২

পাথরের বেঞ্চে হাতলের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে শেখর হেলান দিয়ে বসেছিল। খুব আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটছে। বহুদিন শেখর এইরকম সূর্যোদয় দেখে নি। বাতাস এখন ঠাণ্ডা, ভোরের আলোও হিম, সূর্যের এখনো দেখা নেই, শুধু দূরের জঙ্গলের মাথায় নীলচে আলো। সূর্য উঠলেও জঙ্গলের আড়ালে বহুক্ষণ দেখা যাবে না, শেখর তবুও দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করার চেষ্টায় জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলো। জানে, এই জঙ্গলের বিস্তার বেশিদূর নয়, তবু রাত্রিবেলা মনে হয়েছিল সীমাহীন। ভোরের আলোয় এখন আবার সবকিছুর যথাযথ আয়তন ফিরে আসছে।

সারারাত অসংখ্য সিগারেট খেয়েছে, ভোরের দিকে তাই কাশি আসছিল বার বার। হাতের জ্বলন্ত অর্ধেক সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো, দু'তিনটে ঝরা ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে রগড়ে নাকে ঘ্রাণ নিতে ভারী আরাম লাগলো।

পেছন থেকে কে এসে শেখরের কাঁধে হাত রাখলো। শেখর চমকালো না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললো, রুণি! ঘুমোওনি? একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে!

অপর্ণা কোনো উত্তর দিলো না। ঘুরে এসে শেখরের পাশে বসলো। একটুক্ষণ কোনো কথা না বলে, রুণি তাকিয়ে রইলো বাগানের গেটের দিকে। জয়াদেব বাড়ির গেটটা আজ আর বন্ধ করা হয় নি, খোলাই আছে সারারাত ঘুমোয় নি, কিন্তু অপর্ণার চোখ দু'টিতে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই।

একটু পরে অপর্ণা জিজ্ঞেস করলো, আপনি আজ কলকাতায় যাবেন?

শেখর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, অপর্ণার প্রশ্ন শুনে মন ফিরিয়ে এনে বললো, উঁ? না, এখনো কিছু ঠিক করি নি। দেখা যাক, বেলা হোক।

—ওঁর বাড়িতে খবর দেবেন না?

—না, এখন নয়।

—কে কে আছেন ওঁর বাড়িতে?

—মা, দাদা-বৌদি, এক বোন, খুব ছোট, আট-ন'বছর বয়েস... বলতে বলতেই তপতীর কথা মনে পড়লো শেখরের। একসময় তারা সবাই তপতীকে রবির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হিসেবেই ভাবতো। বারাসতে সেই বাগানাবাড়ির পিকনিকে বৃষ্টির মধ্যে তপতী আর রবির হাত ধরাধরি করে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য—মনে হয়েছিল বহুকাল বহু শতাব্দী ধরে সেই ছবিটা থাকবে। এখন নিউ আলিপুরে সন্তান সম্ভাবা তপতীর কাছে রবির খবর পৌঁছে দেবার কোনো মূল্য আছে কি?

শেখর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো চলো।

অপর্ণা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—চলোই না! রবির কাছে কেউ আছে তো? অসীম তো ঘুমোচ্ছে।

—দিদি আছে।

—ঠিক আছে, চলো, আমরা একটু ঘুরে আসি। খালি পায়েই যাবে?

—সকালবেলা খালি পায়ে হাঁটতে খারাপ লাগবে না।

শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। পর্টুলেকা ফুলগুলো ফুটি-ফুটি করছে। রাত থাকতেই ফুটে আছে অতসীর ঝাড়, ঘন সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটি গন্ধরাজ। গোলাপ ক্ষেতে অনেকগুলো গভীর পায়ের ছাপ, কয়েকটা চারা দুমড়ে নেতিয়ে আছে, কাল রাতে রবিকে ধরাধরি করে বয়ে আনার সময় গোলাপ ক্ষেতের কাছে কেউ সাবধান হয় নি।

গেটের কাছাকাছি এসে শেখর আবার মত বদলে ফেললো।

অপর্ণাকে বললো, না, থাক, রুণি তুমি বাড়িতেই থাকো—আমি একটু একা ঘুরে আসছি।

—আমিও যাবো, চলুন না।

—না, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। দুপুরের দিকেই আবার জামসেদপুর যেতে হতে পারে—

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—স্টেশনের দিকে। আমার একটু কাজ আছে—

ভোরের নরম নির্মল আলোতেও শেখরের মুখ প্রশান্ত হয় নি। মুখে অনেকগুলো চিন্তার রেখা। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা কি বুঝলো কে জানে, সে দৃঢ়স্বরে বললো, না, আপনাকে এখন একা কোথাও যেতে হবে না।

অপর্ণা নিজেই গেটের বাইরে বেরিয়ে এলো। বললো, এমনিই দু'জনে কাছাকাছি একটু হেঁটে আসি। সকালবেলা হাঁটতে ভালো লাগবে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

শেখর বললো, চলো—

সেই সময় দোতলার বারান্দা থেকে সদাশিবের গমগমে গলায় মন্ত্র উচ্চারণ শোনা গেল। সদাশিব সর্বপাপঘ্ন দিবাকরকে প্রণতি জানাচ্ছেন। কাল রাত্রে সদাশিব নিজে গাড়ি চালিয়ে ঘাটশীলা থেকে ডাক্তার ডেকে এনেছেন। তবু আজ ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্যবন্দনা করতে তাঁর ভুল হয় নি।

ওরা কিছু ঠিক করে নি, তবু ওরা বাংলোর দিকেই এগুলো। পথ দিয়ে এর মধ্যেই লোক চলাচল শুরু হয়েছে। আপাতত নিস্তরঙ্গ জীবন, তবু এত ভোরে উঠে মানুষ কিসের জন্য ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে কে জানে!

অপর্ণা বললো, ওকে জামসেদপুরের হাসপাতালেই নিয়ে যাবেন? না কলকাতায়...

—দেখি। দুপুরে ডাক্তার আবার আসুক। জ্ঞান ফিরুক।

—কখন জ্ঞান ফিরবে?

অপর্ণার গলার আওয়াজে এমন একটা বিষণ্ন ভয় ছিল যে, শেখর সচকিত হয়ে তাকালো। হাসলো। আলতোভাবে অপর্ণার হাত ছুঁয়ে বললো, রুণি, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রবির কিচ্ছু হবে না। শক্ত ছেলে, জীবনে ওরকম অনেক আঘাত খেয়েছে।

—ডাক্তার যে বললেন, নার্ভের ওপর—

—ডাক্তাররা ওরকম বলে! আমি রবিকে অনেকের চেয়ে ভালো চিনি।

—আপনি কতদিন চেনেন? খুব একরোখা লোক, তাই না?

—হুঁ। ছেলেবেলা থেকেই চিনি—খুব ইমোশনাল... আচ্ছা রুণি, তুমি এ পর্যন্ত কারুকে চোখের সামনে মরতে দেখেছো? কোনো আত্মীয়-স্বজন?

—না। না। মরার পর দেখেছিলাম, বড় মামার মুখ... কিন্তু চোখের সামনে—না, এ পর্যন্ত কারুকে না!

—আমিও দেখি নি! আমার বাবা যখন মারা যান, তখন একটুর জন্য—আমি ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলাম, গলির মোড়ে এসেছি, সেই সময় কান্না...। তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

—কি?

—চোখের সামনে কারুকে মরতে? আমার ইচ্ছে করে, কেউ মরছে—আমি চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি—শেষ মুহূর্তে নাকি শরীরটা প্রবলভাবে মুচড়ে ওঠে, চোখ ঘুরে যায়।

—আঃ, চুপ করুন! কি হচ্ছে কি?

—না, সত্যিই আমার ধারণা, নিজের মরার আগে একবার অন্য একটা মৃত্যু চোখে দেখা দরকার। কাল রবিকে প্রথম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম—মৃত্যু ধারে কাছে নেই—তোমরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে—তুমি ওরকম ছটফট করছিলে কেন?

—আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলুম। রবিদাকে ওরকম দেখে—কখনো আগে ওরকম দৃশ্য তো দেখি নি—হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল—আগের দিন রবিদা আমাকে ডেকেছিলেন ওঁর সঙ্গে যাবার জন্য আমি যাই নি—আমি অন্যায় করেছি, মানুষকে বুঝতে এরকম ভুল আমার কখনো হয় না।

—হঠাৎ ঐ কথাটাই তোমার তখন মনে হলো?

—হ্যাঁ। আমার মাসতুতো ভাই হিরন্ময়ের কথাও হঠাৎ মনে পড়েছিল একবার—

—কেন, তার কথা কেন?

—ঠিক জানি না। তবে, তার সঙ্গে গিয়ে একবার আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

—বুঝেছি।

বাংলোর সুরকি ঢালা পথের সামনে ওরা থমকে দাঁড়ালো। এক জায়গায় কয়েক ফোঁটা রক্ত তখনো চাপ বেঁধে আছে। সেদিকে চোখ পড়তেই শেখর চোখ ফিরিয়ে নিলো। স্বাভাবিকভাবে বললো, জিনিসপত্রগুলো সব চুরি হয়ে গেছে কিনা একবার দেখে আসি। ঘর বোধহয় খোলাই ছিল সারারাত।

সিঁড়ি দিয়ে ওরা বারান্দায় উঠলো। দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ। কাচের জানলা দিয়ে দেখা গেল, সঞ্জয় উপুড় হয়ে আছে মুখ এক পাশে ফেরানো। সঞ্জয় এদিকের ঘটনা কিছুই জানে না। কাল রাত্রে সারা পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র মানসিক স্বস্তির সঙ্গে ঘুমিয়েছে—তার মুখে সেই চিহ্ন। চোখের পাশটা একটু কুঁচকে রইলেও, হাসির আভাস—সঞ্জয় কোনো স্বপ্ন দেখছে।

আওয়াজ করলো না, ডাকলো না। শেখর ফিসফিসিয়ে অপর্ণাকে বললো, থাক, ঘুমোক। ওকে এখন জাগাবার কোনো দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এসে ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। শেখর বললো, রুণি, তোমার ক্লান্তি লাগছে। নইলে, চলো, কাল রবি যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটা একবার দেখে আসি।

অপর্ণা বললো, আমিও সেই কথাটাই ভাবছিলুম।

রাস্তা চিনতে ভুল হলো না। পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে, পাখির কোলাহল চলেছে অবিশ্রান্ত। দু'জন আদিবাসী কাঁধে কুড়ুল নিয়ে বনের পথ ভেঙে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল, তাদের কুড়ুলের ফলায় রোদের ঝলসানি অনেকক্ষণ চোখে পড়লো। একটু দূর যেতেই দু'জোড়া চটি জুতো দেখা

গেল—অসীম আর অপর্ণার। কাল জুতো খুলে ওরা অরণ্যে প্রবেশ করেছিল সেদিকে তাকিয়ে অপর্ণা হাসলো। নিজের চটি পায়ে গলিয়ে নিয়ে বললো, অসীমদার জুতো, কি হবে? হাতে নেবো?

—জুতো এখন কে বইবে? এই সকালে? দাও আমাকে—অসীমের চটি জোড়া নিয়ে একটা একটা করে শেখর জোরে ছুড়ে মারলো বাংলোর দিকে। বললো, যাক, পরে খুঁজে নেওয়া যাবে।

একটু পরে ওরা সেই জায়গায় পৌঁছুলো। ফুল গাছটার নিচে অনেকখানি কালচে রক্ত, জামার ছেঁড়া একটা টুকরো আটকে আছে কাঁটায়। একটা কাঠবিড়ালী রক্তের ওপর বিভ্রান্তভাবে গন্ধ শুঁকছিল—ওদের দেখে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। অপর্ণা প্রথমেই বললো, কাল আমরা এই ফুল গাছটা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, অনেক ঘুরেও পাই নি, শেষ পর্যন্ত এটার সামনেই—

দিনের আলোয় ফুল গাছটার বিশেষত্ব কিছু নেই। সাদা ফুলগুলোকে মনে হয় কাগজের ফুল, পাতাবিহীন গাছটাকে মনে হয় মরা গাছ শুধু কাঁটাগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। শেখর কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে বললো, এই নাও।

অপর্ণা দু'হাত জোড় করে ফুলগুলো নিলো, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বললো, খুব সামান্য গন্ধ, কিসের মতন যেন, কি রকম একটা ছেলেবেলা–ছেলেবেলার ভাব আছে!

শেখর খর চোখে চারপাশটা তাকিয়ে দেখছে। মাটিতে ঐ রক্ত আর দু'একটা ভাঙা ডাল ছাড়া আর কোনো বৈষম্য নেই। কাঠবিড়ালীটা শাল গাছের ওপর থেকে ব্যগ্রভাবে ওদের দেখছে। একটা কেন্নো খুব মন্থরভাবে চলে যাচ্ছে পায়ের পাশ দিয়ে, এক ঝাঁক শালিক হাসাহাসি করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

শেখর একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, খুব বদলে গেছি আমরা সেটা আজ টের পেলাম।

—কেন?

—কাল রবিকে ওরকমভাবে মেরেছে, আর আজ সকালে আমি তোমাকে ফুল ছিঁড়ে দিচ্ছি। দু'তিন বছর আগে হলে—

—কি করতেন তখন?

—জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিতুম! তুমি জানো না রুণি, কি অসম্ভব রাগ ছিল আমার—যে হারামজাদা রবিকে মেরেছে—তাদের খুঁজে এনে জিভ উপড়ে নিতুম—রবি একটা ছুরি এনেছিল সঙ্গে—সেটা আমিই সরিয়ে রেখেছি—এক একবার ইচ্ছে করছে ছুটে যাই, আবার এক একবার কি রকম যেন—

—আপনাকে কিছুই বোঝা যায় না। আপনি ভীষণ চাপা লোক—

—ছিলুম না এ রকম, পাজী বদমাইশ ছিলুম—এখন কী রকম যেন মনে হচ্ছে, পৃথিবীর একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—সেই নিয়ম অনুযায়ীই সব কিছু চলছে, রবির মার খাওয়াটাও তার মধ্যে পড়ে—

—ওকে কারা মারলো? কেন মারলো?

—ঠিক জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি।

—কেন?

—রবি নিজেকে ভাঙতে চেয়েছিল। এখানে মার না খেলেও অন্য কোথাও ওকে একদিন মার খেতেই হতো।

—কেন?

—আত্মহত্যা তো সবাই করতে পারে না—তোমার জামাইবাবুর মতন! রবি তাই ইচ্ছে করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—

—কেন রবিদার এরকম—

শেখর অসহিষ্ণু বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো, আঃ, কি একঘেয়ে কেন কেন জিজ্ঞেস করছো! তুমি মেয়ে হয়ে যদি এটা বুঝতে না পারো—তোমায় আমি কি করে বোঝাবো।

অপর্ণা আর কোনো কথা বললো না। মুখ নিচু করলো। শেখর সন্দেহ করে অপর্ণার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, ঠিক, দু'ফোঁটা জল টলটল করছে চোখে, এক্ষুনি গড়িয়ে নামবে। শেখর একটু জোরে বললো রুণি। ও কি? কী ছেলেমানুষ তুমি!

অপর্ণা মুখ তুললো, চোখের জলের ফোঁটা দুটোকে কোন অলৌকিক উপায়ে ভেতরে ফেরত পাঠিয়ে দিলো, কাঁদলো না। ফ্যাকাশেভাবে হেসে বললো, কি? কিছু হয় নি তো।

ফুল গাছটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অপর্ণা। তার কমনীয় তন্বী শরীরের ওপর জাফরিকাটা রোদ এসে পড়েছে। নিঃশ্বাসে দুলছে তার বুক, চিবুকের পাশে বহু ভাষার ব্যঞ্জনা। অঞ্জলিবদ্ধ হাত থেকে ফুলগুলো সে ঝরঝর করে মাটিতে ফেলে দিলো।

শেখর বললো, রুণি, কাল পর্যন্ত তুমি কি রকম হাসিখুশি ছেলেমানুষ ছিলে। আজ কেমন গম্ভীর আর চাপা, সে রকম হাসছো না—জঙ্গলে এসে তুমিও বদলে গেলে?

—বদলাবো না? সবাই বদলায়।

—তুমি কেন বদলাবে। যারা সরল আর নিষ্পাপ, তারা সব জায়গাতেই একরকম।

অপর্ণা এবার স্পষ্ট করে হেসে বললো, আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো? আমি কি কচি খুকি নাকি?

—কচি খুকি না হলেও, তুমি সত্যিই সরল মেয়ে।

—আপনি মেয়েদের চেনেন না। মেয়েদের সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই মনে হচ্ছে!

—তোমাদের আজকালকার মেয়েদের এই একটা ফ্যাশান হয়েছে। সরল কিংবা নিষ্পাপ শুনলে খুশি হও না। নিজেকে খুব একটা জটিল আর রহস্যময়ী ভাবতে খুব ভালো লাগে, তাই না?

—না শেখরদা, আমি সরল থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। আমি অনেক মানুষকে দুঃখ দিয়েছি।

—তোমাদের ঐ সব সখের দুঃখ তো। প্রেম-প্রেম খেলা। তোমাকে একজন ভালবেসেছিল, তুমি তাকে ভালবাসো নি—তারপর তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল—এইসব তো? তোমরা মেয়েরা এই ভেবে খুব আনন্দ পাও, কিন্তু মানুষের জীবন অত সহজে ব্যর্থ হয় না।

—আপনি বুঝি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—এইসব ছেলেমানুষী ভালবাসায় বিশ্বাস করি না।

—আপনি কোথায়ও নিশ্চয়ই কঠিন আঘাত পেয়েছে!

—কোনো আঘাত পাই নি। তোমাকে পাকামি করতে হবে না!

—আমি কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে চাই নি। আমার দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই, আমি এ পর্যন্ত ভালবাসার ব্যাপারটা নিজের মধ্যে টেরই পেলাম না। আমার ব্যাপারটা শুনবেন? আমাদের বাড়ি থেকে বরাবরই আমরা খুব স্বাধীনতা পেয়েছি। যখন খুশি যার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি, আমি ড্রাইভিং জানি, গাড়ি নিয়ে যখন-তখন বেরিয়ে গেছি—আমাদের দেশে এরকম স্বাধীনতা অনেক মেয়েই পায় না। অনেক ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তারা আমাকে দামি রেস্তরাঁয় খেতে নিয়ে গেছে, গাড়িতে করে বেড়িয়েছে, আর একটু আড়াল হলেই ভালবাসার কথা বলেছে, কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি? দু'তিন বছর ওরকম অনেকের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে প্রেমের রিহার্সাল

দিলে তারপর ওদের মধ্যে কেঁদে কেটে সবচেয়ে যে ভালো চাকরি করে আর সবচেয়ে যাকে ভালো দেখাতে—তাকে একদিন বিয়ে করে ফেলবে—তোমাদের মতন মেয়েদের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।

—মোটেই স্বাভাবিক নয়! আপনি ভাবেন আপনি সব বোঝেন, তাই না? মোটেই বোঝেন না! ঐ সব ছেলেদের মুখে ভালবাসার কথা শুনলেই আমার কি রকম অ্যালার্জি হয়। সবাই একই কথা বলে! কেউ একটু রসিকতা করতে জানে, কেউ ভালো ইংরাজিতে বলে, কথা সবারই এক! এটা কি করে হয়? একটা মেয়ের সঙ্গে একটু আড়াল পেলেই সবার মধ্যে ভালবাসা জেগে ওঠে? ঘেন্না ধরে গেছে আমার ওরকম ভালবাসায়—

শেখর যেন অপর্ণার কথায় বেশ মজা পাচ্ছে—এইভাবে মুচকি হাসতে লাগলো। সিগারেট খেলেই কাশি হচ্ছে, তবু আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে শেখর বললো, আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যাপারটা। তুমি বড়লোকের মেয়ে, এক ধরনের হাল্কা বড়লোকের ছেলের সঙ্গেই তোমার আলাপ হয়েছে। তারা ঐরকমই তো। অন্য ধরনের ছেলেদের সঙ্গে তো মেশো নি।

অপর্ণা ঝাঁঝালো গলায় বললো, বড়লোক-গরিবের কথা এর মধ্যে তুলবেন না! গরিবের ছেলেদেরও দেখেছি—তারা প্রেম নিয়ে আরও বেশি প্যানপ্যানানি করে—তারা রসিকতা করতেও জানে না সব সময় একটা কাতর কাতর ভাব দেখায়। আমি আপনার বন্ধুদেরও ঐরকম ভেবেছিলাম!

—আমার বন্ধুদের? তারা কেউ ওরকম ন্যাকা নয়।

—আপনার কথা বলছি না, আপনি তো সাধু-পুরুষ দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনার অন্য বন্ধুরা—

—আমার বন্ধুরাও কেউ দু'একদিনের আলাপে প্রেমের কথা শোনাবে না।

অপর্ণা একটু চুপ করে বসে রইলো, সাদা ফুলগাছটার তীক্ষ্ণ কাঁটায় আঙুল বুলোতে বুলোতে আবার বললো, আমি রবিদাকেও তাই ভেবেছিলাম। রবিদা যখন একা একা আমাদের বাড়িতে গিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে ডাকলো—আমি সেটাকেও হাল্কা ব্যাপার ভেবেছিলাম—কিন্তু তারপর থেকে সব সময় আমি মনের মধ্যে রবিদার সেই ডাক শুনতে পাচ্ছি! এরকম আমার আগে কখনো হয় নি। আমার মনে হচ্ছে—এই প্রথম আমার জীবনে একটা সত্যিকারের ডাক এসেছিল—কিন্তু আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়েছি! আমি বোকা, দারুণ বোকা! হয়তো, আমার ভুলের জন্যই রবিদার এরকম হলো।

শেখর একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, তুমি খানিকটা দায়ী নিশ্চয়ই। তোমারই মতন আর একটা মেয়ে, তপতী তার নাম—সে-ও...

অপর্ণা হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বললো, বলবেন না! আর কারুর কথা আমাকে বলবেন না! রবিদার জীবনের অন্য কোনো কথা আমি শুনতে চাই না!

শেখরের দিকে পেছন ফিরে অপর্ণা দাঁড়িয়ে রইলো। তার সারা শরীরটা কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ তাকে সেইভাবেই থাকতে দিলো শেখর। ওর ব্যাকুলতা দেখেও শেখরের মুখ-টেপা হাসিটা মেলায় নি। যেন সারা রাত জেগে থাকার পর ভোরবেলায় এই রকম ঘটনাই ঠিক মানায়—এইরকম তার ভাব। একটু পরে, অপর্ণা নিজেকে একটু সামলে নিতে শেখর জিজ্ঞেস করলো, রুণি, এখানে একটু বসবে?

—আমার এই জায়গাটায় থাকতে কি রকম অস্বস্তি লাগছে!

চলুন এবার ফিরে যাই।

এসো। শেখর হাত বাড়িয়ে দিলো।

সদাশিব সেই একই ভঙ্গিতে বারান্দার ইজিচেয়ারে বই হাতে নিয়ে বসে আছেন। দেবকুমারকে নিয়ে বাগানে খেলা করছে পরমেশ্বর। দূর থেকে ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। এই রকম সময়েই শেখররা এই স্টেশনে নেমেছিল।

ওরা সদাশিবের সামনে এসে দাঁড়ালো। সদাশিব চোখ তুলে বললেন, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে। ভয় নেই। স্বাস্থ্যবান ছেলে, সহ্য করে নেবে—

কাল রাত্রে সদাশিব একবারও প্রশ্ন করেন নি, কারা রবিকে মেরেছে, কেন মেরেছে। জঙ্গলে অত রাত্রে ওরা কেন ঘুরছিল। শুধু আহত মুমূর্ষু রবিকে দেখে তিনি বলেছিলেন, একি, এমন সুন্দর ছেলে, তার এই অবস্থা কেন? আমি এক্ষুনি ঘাটশীলার কপার মাইনস্ থেকে ডঃ সরকারকে নিয়ে আসছি, তোমরা গরম জল করে ভালোভাবে ওয়াশ করে দাও—

শেখর জিজ্ঞেস করলো, ওকে কি আজই হাসপাতালে রিমুভ করবো?

সদাশিব চোখের ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বসো।

অপর্ণা ওদের পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠে গেল। সিঁড়িতে দেখা হলো জয়ার সঙ্গে। জয়া উদ্ভাসিত মুখে বললো, জ্ঞান ফিরে আসছে। জ্ঞান ফেরার পরেই কি চিৎকার! কষ্ট হচ্ছে তো খুব।

সে দিদির দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললো, কথা বলতে পারছে?

—মাঝে মাঝে। বেশিক্ষণ জ্ঞান থাকছে না একসঙ্গে।

—তোকে চিনতে পেরেছে?

—হ্যাঁ। তোরা কোথায় গিয়েছিলি!

অপর্ণা ঘরে ঢুকলো। মাথার কাছে টুলে বসে আছে অসীম, অতক্ষণ পর সে তখন একটু ঘুমে ঢুলছে। অপর্ণাকে দেখে সে-ও একই কথা বললো, জ্ঞান ফিরে এসেছে রবির। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

অপর্ণা কথার উত্তর দিলো না। রবির মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। সারা মুখ জোড়া ব্যান্ডেজ...চোখ দুটো আর নাকটা শুধু খোলা। পায়েও ব্যান্ডেজ। বিছানার পাশ দিয়ে একটা হাত করুণভাবে ঝুলছে। অর্পণা সেই হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো।

রবি চোখ খুলে তাকালো। আবছা ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে চেনার চেষ্টা করলো। চোখে কয়েকটা তরঙ্গ খেলা করে গেল। অস্ফুটভাবে বললো, কে? তপতী?

—না, আমি রুণি! অপর্ণা!

রবি আবার স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো শরীর, তবু একদৃষ্টে রুণির দিকে তাকিয়ে থেকে যেন সত্যিই ভালো করে চিনতে পারলো! সঙ্গে সঙ্গে রবি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। বিকৃত গলায় বললো, শেখর কোথায়?

অপর্ণা শক্ত করে রবির হাতটা চেপে ধরে থেকে বললো, না, হাত ছাড়িয়ে নেবেন না!

রবি আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। পারলো না। তখন সে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো।